ছোটদের পদ্মাপুরাণ

নিউ বেঙ্গল প্রেস প্রাঃ লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩

উপহার

মূলকথা

মানুষের কল্পনায় দেবতার স্থান অতি ঊর্ধ্বে। দেবতা স্বর্গে বাস করেন; অনন্ত ক্ষমতার অধিকারী তিনি, সুখ-দুঃখ জন্ম-মৃত্যু তাঁরই ইচ্ছায় মানুষকে বরণ করে' নিতে হয়।

কিন্তু ক্ষুদ্র মানুষের কাছে দেবতারও কি কোনো প্রার্থনার জিনিস নেই? মানুষ কি তাঁর কাছে চিরদিনই উপেক্ষা ও অবহেলার বস্তু? সে কি কৃপার পাত্রই রয়ে' গেলো চিরকাল?—এই প্রশ্নেরই যেন একটা জবাব দিতে পদ্মাপুরাণ রচিত হোলো, আর তাতে দেখান হোলো মাটির মানুষের সাথে স্বর্গের দেবতার দ্বন্দ্ব। দেবতা আর দূরে রইলেন না, সুখে-দুঃখে গড়া মানুষের সাংসারিক দৈনন্দিন জীবনের প্রীতি-স্নেহ-বিরোধ-কলহের সঙ্গে জড়িয়ে ফেললেন নিজেকে। এই জন্যই পদ্মাপুরাণের কাহিনী এত জনপ্রিয় হয়েছে, এই জন্যই এর এত মর্যাদা!

কাজেই ছোটদেরও তা জানা প্রয়োজন, আর সেই জন্যই এ গ্রন্থের আবির্ভাব।

অসীম ক্ষমতাশালিনী দেবী মনসা! তাঁর প্রসাদে হীরা-মুক্তা-খচিত প্রাসাদ গড়ে' ওঠে, আর তাঁর ক্রুদ্ধ ভ্রূকুটিতে ও তাঁর উগ্রচণ্ডা মূর্তিতে স্বর্গের অমৃত শুকিয়ে যায়, বিশ্বের মাটিতে তখন জ্বলে' ওঠে এক বিষের দাবানল! অনন্ত সৌন্দর্যময়ী দেবী মনসার নাম তাই তাঁর মুগ্ধ ভক্তবৃন্দের কাছে কখনো পদ্মাবতী, আর তাঁর বিষভীত ত্রাসিত ও শিহরিত জগতের কাছে কখনো বা বিষহরী।

কিন্তু ভুল শুধু মানুষই করে না, দেবতারও ভুল হয়। মনসাদেবীও বুঝি ভুল করলেন!

আশ্রিত নিরীহ পক্ষিশাবক ভক্ষণ করে' নিষ্ঠুর সর্পকুল যে পাপ করেছিল, তারই প্রতিহিংসা-উদ্ভূত চন্দ্রধর বা চাঁদ-সওদাগর যখন প্রতিশোধ-পরায়ণ হয়ে পৃথিবীর সর্পবংশ ধ্বংস করতে সুরু করে' দিয়েছিলেন, দেবী মনসা তখন তাঁর নিষ্ঠুর প্রজাদেরই পক্ষ নিয়ে রুখে দাঁড়ালেন তাঁর রুদ্রমূর্তিতে! হিংসার জন্য যে শাস্তি বা অনুশোচনা প্রয়োজন, মনসাদেবী তা একবারও ভাবলেন না, তিনিও তাঁর উগ্র বিষ-জর্জর হিংসার দ্বারাই তার প্রতিবিধানে উদ্যত হলেন—অর্থাৎ, স্বর্গের দেবী তখন ঘৃণ্য হিংসার ঐশ্বর্যে পৃথিবীর মানুষকে পরাজিত করে' অমর হতে চাইলেন!

কিন্তু তার ফলে দেবতারই হোলো পরাজয় আর স্বর্গের দৈবীশক্তি হোলো নশ্বর মানবের উপেক্ষার বস্তু। শুধু তাই নয়, চাঁদ-সওদাগরের দৃঢ়-মনোবল, দৃপ্ত-পৌরুষ ও একাগ্র-সাধনার কাছে কালকূট-গরলের অধীশ্বরী পদ্মাবতী বা মনসাদেবীও ভক্তির কাঙাল হয়ে তাঁর বিষ-জর্জর শুষ্ককণ্ঠে হাহাকার করে' উঠলেন!

সঙ্গে সঙ্গে প্রমাণ হয়ে গেলো যে, মানুষ নশ্বর হলেও কখনো তুচ্ছ নয়, সে উপেক্ষা বা অবহেলার বস্তু নয়।

প্রমাণ হয়ে গেলো যে, মানুষই দেবতাকে দেবত্ব প্রদান করে; মানুষের ভক্তি ও পূজার উপচারেই স্বর্গের তৃপ্তি ও সার্থকতা। মানুষ যদি ভক্তি-বিমুখ হয়, তাহ'লে স্বর্গের দেবতা মুহূর্তে ধুলোয় মিশে যান,—তাঁর উচ্চ-সিংহাসন ও ক্ষমতার ঐশ্বর্য এই নশ্বর পৃথিবীর প্রাণশক্তিকে কেন্দ্র করেই শুধু অব্যাহত রইতে পারে!—

পদ্মাপুরাণের এই হোলো মূলকথা। ইতি—

প্রকাশক

সূচীপত্র

চাঁদ সওদাগরের পদ্মাপূজা

চন্দ্রধরের কথা

অনেক—অনেক দিন আগে আমাদের এই দেশে চম্পক নামে এক বিখ্যাত নগর ছিল। ধনে-জনে ছিল এই নগরটি পরিপূর্ণ, ব্যবসা-বাণিজ্যের ছিল একটি বিশিষ্ট কেন্দ্র।

কত বড় বড় বণিক্, কত মহাজন, কত সওদাগর যে এই নগরে বাস করতেন তার আর সীমাসংখ্যা নেই।

চম্পক-নগরটি সর্বদাই যেন অতুল ঐশ্বর্যে ডুবে থাকত! দিনরাত চলত সেখানে আমোদ-উৎসব। নগরবাসীদের মনে বুঝি আর আনন্দের সীমা ছিল না! কারুর খাওয়া-পরার কোনো অভাব ছিল না, দুঃখ-দারিদ্র্যের কথা লোকে জানত না; কেবল আনন্দ—আনন্দ আর আনন্দ।

এই বিখ্যাত নগরে বাস করতেন এক ধনবান্ বণিক্—নাম তাঁর রাজা কোটীশ্বর।

বাস্তবিক কোটীশ্বর রাজার মতই ছিলেন ধনবান্, তাই লোকে তাঁকে 'রাজা' উপাধি দিয়েছিল। কোটীশ্বরের যশের সৌরভ ছড়িয়ে পড়েছিল দূর-দূরান্তরে। ধনে-মানে, বংশমর্যাদায় তাঁর তুলনা বুঝি আর ছিল না সে সময়ে! কোটীশ্বরের নাম মুখে আনতে লোকে যেন একেবারে মেতে উঠত।

লোকের দোষও থাকে আবার গুণও থাকে। কিন্তু কোটীশ্বরের বুঝি দোষ বলতে বিশেষ কিছুই ছিল না।

তাই তাঁর শত্রু বলেও কেউ ছিল না! সবাই বন্ধু, সবাই আত্মীয়,—সবাই দরদী-হিতৈষী পরিজন।

এই কোটীশ্বরের ছিলেন এক ছেলে, নাম তাঁর চাঁদ বা চন্দ্রধর। চাঁদ তো যেন সত্যিকারেরই চাঁদ! এমন ভুবন-ভোলানো রূপ বুঝি আর দেখা যায় না! যে তাঁর রূপ দেখে সেই যেন মুগ্ধ হয়ে যায়, সে অপরূপ রূপ দেখলে অতি বড় পাষণ্ডেরও যেন স্নেহরস উথলে ওঠে।

এখন এই চাঁদের একটি অদ্ভুত জন্মবৃত্তান্ত আছে। সে কথা আগে বলা দরকার।

পদ্মশঙ্খ নামে ছিলেন এক মুনি। মুনি ছিলেন পরম তপস্বী, অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ। অতবড় তেজস্বী মুনি সে কালেও বড় একটা দেখা যেত না।

একদিন রাত্রে সুরু হোলো ভীষণ ঝড়বৃষ্টি। সে কী ভীষণ ঝড়, বাপ্‌রে বাপ্‌, সমস্ত আকাশ যেন হুড়্‌মুড়্‌ করে' ভেঙে পড়তে চায়! ঝড়ের তাণ্ডবে গাছপালা সব লণ্ডভণ্ড! বিদ্যুতের চমকে চোখ যেন অন্ধ হবার যোগাড়! বাজের শব্দে কানে তালা লেগে যায়! এই দুর্যোগের মধ্যে মুনির আশ্রমের কাছে ভেঙে পড়ল একটি প্রকাণ্ড গাছ।

গাছটি তো ভেঙে পড়ল বাতাসের ঝাপ্টায়। এখন এই গাছের কোটরে ছিল দুটি পাখীর ডিম। ডিমগুলিও গাছের সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে পড়ে' গেল, কিন্তু ভাগ্যক্রমে ভাঙল না।

সকাল বেলা আর দুর্যোগ নেই। পদ্মশংখ মুনি স্নান করতে সরোবরে চলেছেন, হঠাৎ ডিম দুটি তাঁর নজরে পড়ল।

মুনির অন্তঃকরণ ছিল বড়ই নরম। কারুর দুঃখ তিনি সইতে পারতেন না। ছোট্ট ডিম দুটির জন্যেও তাঁর মায়া হোলো।

পরম-দয়ালু মুনিবর স্নান সেরে আশ্রমে ফিরবার সময় অতি-যত্নের সংগে ডিম দুটিকে নিয়ে গেলেন আর এক গোপনীয় স্থানে রেখে দিলেন।

কিছুদিন পরেই ডিম ফুটে দুটি সুন্দর বাচ্চা বের হোলো। পাখীর ছানা দুটিকে দেখে মুনির আর আনন্দের সীমা নেই। তিনি তাদের খাইয়ে-দাইয়ে বড় করে' তুল্লেন।

এই রকমে দিন যায়। ক্রমে ক্রমে এই পাখী দুটি আরো বড় হয়ে উঠল আর কিছুদিন পরে এই পাখী দুটির আরো বাচ্চা-কাচ্চা হতে লাগল, আর মুনির আশ্রমটি পাখীর কলরবে ভরে' উঠল। তাদের মিষ্টি গানে গানে সারা আশ্রমটি যেন আনন্দ-উৎসবে মেতে উঠল।

আগেই বলেছি, মুনির মনটি ছিল বড়ই নবম। তাই তিনি তাঁর অন্তরের সমস্ত মমতা উজাড় করে' পুত্রস্নেহে পাখীদের পালন করেছেন। তাদেব সুখে-দুঃখে তাঁর সুখ-দুঃখ। তাদের একটিকে না দেখলে মুনি যেন চোখে অন্ধকাব দেখেন। এমনি মায়ায় জড়িয়ে পড়েছেন তিনি।

একদিন মুনি নিমন্ত্রণ খেতে আশ্রমের বাইরে গেলেন, সে রাত্রে আর তাঁর বাসায় ফেরা হোলো না। এই সুযোগে সেই রাত্রে একদল সাপ এসে সমস্ত

পাখীগুলিকে খেয়ে শেষ করে' ফেল্ল। একটি পাখীও আর আশ্রমে রইল না।

বাড়ী ফিরে মুনিবর অবাক্ হয়ে গেলেন, আশ্রমে একটিও আর পাখী নেই। যে-আশ্রমটি পাখীর কোলাহলে সর্ব্বদাই মুখরিত হয়ে আনন্দের ঝর্ণা বইয়ে দিত, আজ সেখানে যেন 'টুঁ' শব্দটি পর্য্যন্ত নেই। চারদিক যেন মরু-ভূমির মত খাঁ-খাঁ করছে!

কোথায় গেল তাঁর পরম আদরের পাখীর দল! পাগলের মত তিনি ছট্‌ফট্ করতে লাগলেন। আশ্রমের সমস্ত গাছগুলি তন্ন তন্ন করে' খুঁজেও তাদের একটিরও সন্ধান পেলেন না। মুনি কিছু বুঝতে না পেরে অবশেষে ধ্যানে বসলেন।

যোগ-বলে সমস্ত বিষয় জানতে পেরে মুনি ছেলেমানুষের মত হাউ হাউ করে' কেঁদে উঠলেন পাখীদের দুঃখে।

কিছুক্ষণ ধূলায় লুটিয়ে মুনিবর কাঁদলেন, তারপর উঠে বল্লেন, "এজন্মে এই দুঃখ আর সহ্য করতে পারব না, এর কোনো প্রতীকার করতে পারব না। আমি কামনা-সাগরে গিয়ে প্রাণবিসর্জন করব, তারপর পরজন্মে নাগ-হন্তা হয়ে পৃথিবীতে আবার জন্মগ্রহণ করব। সমস্ত সর্পকুল হবে আমার শত্রু।"

সর্পজাতির উপর দারুণ ক্রুদ্ধ হয়ে এই কামনা করে' মুনি প্রাণত্যাগ করলেন।

এই মুনিই এসে জন্মগ্রহণ করলেন কোটীশ্বর বণিকের ঘরে তাঁর পুত্র-রূপে। ইনিই হচ্ছেন আমাদের চন্দ্রধর বা চাঁদ-সওদাগর।

মহাদেবের বর

চাঁদের রূপ আকাশের চাঁদের মতই সুন্দর। চাঁদের মতই ঢলঢলে মুখ-খানা দেখে রাজা কোটীশ্বর ছেলের নাম রেখেছেন চাঁদ।

সোনার চাঁদ ছেলে—, যে তার রূপ দেখে সেই মুগ্ধ হয়ে যায়। তাকে পেয়ে বাপ-মায়ের আর সুখের অন্ত নেই। দিনরাত কোলে কোলে রাখেন, একটু চোখের আড়াল হলেই রাজা কোটীশ্বর যেন চোখে অন্ধকার দেখেন।

এই ভাবে দিন যায়, মাস যায়, বছর চলে' যায়। শুক্লপক্ষের চাঁদের কলার মত রাজকুমার বেড়ে উঠতে লাগলেন। লেখাপড়ার সঙ্গে-সঙ্গে তিনি শিখতে লাগলেন ভোজবিদ্যা, মল্লবিদ্যা, ধনুর্বিদ্যা ইত্যাদি। যা শেখেন তাতেই তিনি সুদক্ষ হয়ে ওঠেন। গুরুরা তাঁর প্রতিভার পরিচয় পেয়ে একেবারে অবাক্‌!

এইবার রাজা কোটীশ্বর ছেলেকে সকল বিদ্যায় নিপুণ দেখে তাঁর বিয়ের আয়োজন করলেন। শঙ্খপতি নামে একজন বিখ্যাত সওদাগর ছিলেন, তাঁর রূপে-গুণে অদ্বিতীয়া একটি কন্যা ছিল। নাম ছিল তাঁর সুনুকা।

এই রূপবতী ও গুণবতী কন্যা সুনুকার সঙ্গে মহাসমারোহে চাঁদের বিয়ে হয়ে গেল।

এর কিছুদিন পরেই রাজা কোটীশ্বর পরলোক-গমন কবলেন। চাঁদও বিধিমতে বাবার শ্রাদ্ধশান্তি করে' পুত্রের কর্তব্য শেষ করলেন।

চাঁদ-সওদাগর ছিলেন শিবের মহাভক্ত। তিনি সর্বদাই পার্বতী আব শিবের পূজা কবতেন আর তাঁদের আশীর্বাদ প্রার্থনা করতেন। শেষে একদিন তুষ্ট হয়ে মহাদেব পার্বতীকে সঙ্গে করে' তাঁকে দেখা দিলেন আর বল্লেন, "হে বৎস, আমি তোমার ভক্তিতে পরম তুষ্ট হয়েছি। বল তুমি কি বর প্রার্থনা কর।"

চাঁদ-সওদাগর শিব-পার্বতীকে সামনে দেখে তাঁদের পায়ে লুটিয়ে পড়লেন, তাবপর হাতজোড় করে' গদ্‌গদস্বরে মহাদেবকে বল্লেন, "হে প্রভু, আমাকে মহাজ্ঞান দান করুন। সাপ আমার মহাশত্রু, তারা যেন আমার কোনো অনিষ্ট করতে না পারে,—এইজন্যই আমি মহাজ্ঞান প্রার্থনা করছি।"

চাঁদের কথা শুনে মহাদেব সন্তুষ্ট হলেন আর তাঁর কানে কানে মহাজ্ঞান-মন্ত্র শুনিয়ে দিলেন।

এইবার দেবী পার্বতী ভক্ত চাঁদকে একটি হেমতালের লাঠি দিয়ে বল্লেন, "হে চাঁদ, তুমি এই হেমতালের লাঠিটি গ্রহণ কর। এই লাঠিটি সাপদের কাছে মৃত্যুতুল্য অস্ত্র। এই লাঠি সঙ্গে থাকলে-তোমার আর ভয় নেই। যত বড় বিষধর সাপই হোক্, তোমার কোনো অনিষ্ট করতে পারবে না। বরং তোমাকেই তারা ভয় করে' চলবে।"

● **মহাদেবের বর** ●

অস্ত্র পেয়ে চাঁদের তো আর আনন্দের সীমা নেই। আবার তিনি তাঁদের পায়ে লুটিয়ে পড়লেন।

হর-গৌরী তুষ্ট হয়ে বল্লেন, "হে বৎস চাঁদ, তোমার আর কোনো চিন্তা নেই। বিপদে পড়লে আমাদের স্মরণ কোরো, আমরা তোমার বিপদ দূর করব। আমরা তোমার ভক্তিতে অত্যন্ত তুষ্ট হয়েছি। যখনই ডাকবে তখনই দেখা দেব।" হর-পার্বতী চন্দ্রধরকে বর দিয়ে প্রস্থান করলেন। আর চাঁদকে পায় কে! সর্পকুল ধ্বংস করবার জন্যে তিনি একেবারে মরিয়া হয়ে উঠলেন।

রাজ্যের সমস্ত সাপুড়েদের তিনি ডেকে পাঠালেন আর হুকুম দিলেন, "যেখানে যত সাপ পাও, সব ধরে' নিয়ে এসো। পাহাড়ে, জঙ্গলে, ঘাটে, মাঠে, নদীতে, সাগরে,—যেখানে যে সাপ পাবে, একটাকেও ছেড়ো না। সব ধরে' আমার কাছে নিয়ে এসো।"

চাঁদের আজ্ঞা পেয়ে সাপুড়েরা দলে দলে পাহাড়ে-জঙ্গলে গিয়ে শত শত সব বিষাক্ত সাপ ধরে' নিয়ে আসতে লাগল, আর চাঁদ-সওদাগর সেই সাপগুলিকে ধরে' পাথরের উপর আছ্‌ড়ে আছ্‌ড়ে মারতে লাগলেন।

এইভাবে সর্পকুল ধ্বংস হতে লাগল। দেশে যত সাপ আছে তারা তো ভয়ে অস্থির। কেউ আর চম্পক-নগরের দিকে যায় না। চাঁদ-সওদাগরের নাম শুনলেই তাদের প্রাণ কাঁপতে থাকে। সাপ দেখতে পেলেই চন্দ্রধর তাকে পাথরের উপর আছ্‌ড়ে মেরে ফেলেন। শিবের বরে তাঁর কোনো ভয় নেই, মহাজ্ঞান-মন্ত্র পেয়েছেন তিনি। কোনো সাপই তাঁর কোনো অনিষ্ট করতে পারে না।

সাপের রাজ্যে হুলস্থুল পড়ে' গেল। হায়, এবার বুঝি আর কারুর রক্ষা নেই! দেশের সব বড় বড় বিষাক্ত সাপেরা প্রায় উজাড় হয়ে এসেছে। বাকী যে কয়েকটি আছে, তারা কোনো রকমে আত্মগোপন করে' দিন কাটায়। অন্যান্য সাপেরা একটু সুযোগ বুঝলেই চাঁদের রাজ্য ছেড়ে পালায়।

এদিকে মনের সাধে সাপ মেরে চন্দ্রধর বেশ সুখেই দিন কাটান। ক্রমে তাঁর ছয়টি ছেলে হোলো। নাম রাখা হোলো তাদের—ত্রিলোচন, দিগম্বর, হরিহর, কৃষ্ণদাস, বিষ্ণুদাস আর গদাধর।

এই ছয়টি ছেলে যখন বড় হয়ে উঠলেন, তখন ছয়টি সুন্দরী আর গুণ-বতী মেয়ের সঙ্গে তাঁদের বিয়ে দেওয়া হোলো।

এই মেয়েদের নাম হচ্ছে—লীলাবতী, কলাবতী, পদ্মগন্ধা, হীরাবতী চন্দ্ররেখা আর মোহিনী।

ছেলেদের বিয়ে দিয়ে চন্দ্রধর পরম তৃপ্তির সঙ্গে দিন কাটাতে লাগলেন, আর নিষ্ঠুরভাবে সাপের কুল ধ্বংস করতে লাগলেন।

মনসাদেবী হচ্ছেন সাপেদের রক্ষাকর্ত্রী, তাদের মায়ের মত। ত্রিভুবনের যত সাপ তাঁকে শ্রদ্ধা করে, ভক্তি করে; বিপদে পড়লে এসে শরণ নেয়। মনসার আর এক নাম পদ্মাবতী। তাঁর যেমনি রূপ তেমনি গুণ। শিবের মেয়ে তিনি কাজেই বুঝতে পারছ যেমন তেমন মেয়ে ন'ন মনসাদেবী।

চাঁদ-সওদাগর পৃথিবীর সাপ মেরে উজাড় করে' ফেলছেন,—কাজেই মনসাদেবী কি আর চুপ করে' থাকতে পারেন! সাপেরা যে তাঁর সন্তানের মত। নাগ-মাতা বলে' তিনি ত্রিভুবনে বিখ্যাত। সাপেরা বিপদে পড়লে এসে তাঁর শরণ নেয়। কাজেই তিনি স্থির করলেন যে করেই হোক, সাপেদের রক্ষা করতে হবে।

এদিকে চন্দ্রধর মনসাদেবীর উপর হাড়ে-হাড়ে চটা। কিছুদিন আগে এক বিয়ের সভায় মনসাদেবীর সংগে তাঁর ভীষণ ঝগড়া হয়ে গেছে। দু'জনেই দু'জনকে দস্তুরমত অপমান করেছেন! মনসাদেবীও সেই থেকে চাঁদ-সওদাগরের উপর চটে' আছেন, কিন্তু শিবের কাছ থেকে চাঁদ মহাজ্ঞান লাভ করেছেন, তাই তিনি চাঁদের কোনো ক্ষতি করতে পারছেন না।

মনসাদেবীর বন্ধু ছিলেন শিবের আর এক মেয়ে। নাম তাঁর নেতা। এই নেতাকে সঙ্গে নিয়ে একদিন পদ্মাবতী চললেন চন্দ্রধরের রাজ্যে, চম্পক-নগরে।

চম্পক-নগরের প্রান্ত দিয়ে বয়ে' চলেছে কুলকুল শব্দে এক চমৎকার নদী। তার তীরে গিয়ে পদ্মাবতী নেতাকে বল্লেন, "আজ এখানে একটা মজা করব,—একটু যাদু-বিদ্যা দেখাব।"

নেতা বল্লেন, "কি রকম যাদু-বিদ্যা দেখাতে চাও তুমি?"

পদ্মাবতী বল্লেন, "এই যে সামনের নদীতে কত মাছ খেলা করছে দেখতে পাচ্ছ। আমার যাদু-বিদ্যার বলে সব মাছকে অদৃশ্য করে' দেব।"

এই বলে' পদ্মাবতী এক কৌশল অবলম্বন করলেন,—জলের মাছগুলিকে মায়াবলে অদৃশ্য করে' দিলেন।

বাস্তবিক বড় রহস্যজনক ব্যাপার। রোজই জেলেরা এসে নদীতে জাল ফেলে বিস্তর মাছ পায়। কিন্তু আজ একি হোলো! জালে যে একটা মাছও উঠছে না। তারা ক্রমেই যেন নিরাশ হয়ে উঠতে লাগল, কিন্তু এ যে পদ্মাবতীর কৌশল তা' তারা কিছুই বুঝতে পারল না। আসলে পদ্মাবতী নদী পার হবার জন্যেই এই মায়ার খেলা দেখিয়েছিলেন।

তাদের দুরবস্থা দেখে পদ্মাবতী হাসিমুখে বল্লেন, "আমাদের যদি নদী পার করে' চম্পক-নগরে নিয়ে যাও, তবে আমার আশীর্বাদে আবার অনেক মাছ পাবে।"

জেলেদের মধ্যে দুই ভাই ছিল সর্দার, নাম তাদের জালু আর
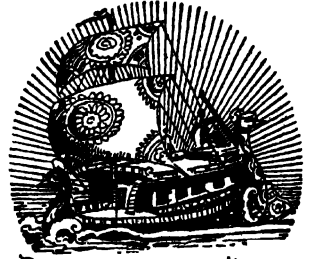
মালু। পদ্মাবতীর কথা শুনে তারা বল্লে, "বেশ তো, এ আর একটা বেশী কথা কি! শীগ্‌গির তোমরা এসে আমাদের নৌকায় ওঠো, তোমাদের চম্পক-নগরে চট্‌পট্ পৌঁছে দেব।"

জেলেরা পদ্মাবতী আর নেতাকে নিয়ে চল্ল চম্পক-নগরের দিকে। মাঝ-নদীতে এসে দেবীর আশীর্বাদে নদীতে জাল ফেলে তারা অনেক বড় বড় মাছ পেতে লাগল। শুধু তাই নয়, নদী থেকে জালে উঠল দুটি সুন্দর সোনার ঘট্।

ঘট্ দেখে তো জেলের দল অবাক্। পদ্মাবতী তাদের বল্লেন, "এই ঘট্ তোমরা ভক্তির সঙ্গে বাড়ীতে নিয়ে যাও আর রোজ রোজ পূজা কর। একান্ত ভক্তিভরে যদি আমার এই ঘট্ পূজা করতে পার, তবে আমার আশীর্বাদে রাজার মত তোমাদের অতুল সম্পদ হবে, তোমাদের সমস্ত অমঙ্গল আর অশান্তি দূর হয়ে যাবে।"

জালু আর মালু প্রথমে পদ্মাবতীকে দেবী বলে' চিনতে পারে নাই। কিন্তু ক্রমেই পরিচয় পেয়ে বুঝতে পারল—এঁরা সামান্য মেয়েলোক নয়, নিশ্চয় স্বর্গের দেবী। না হলে এঁদের আশীর্বাদের জোরে নদীতে বড় বড় মাছও পাওয়া যেত না, আবার দুটি সোনার ঘট্ও বরাতে জুটে যেত না।

———

জালু-মালুর বরাত ফিরে গেছে। তারা রীতিমত ভক্তির সঙ্গে ধুমধাম করে' পদ্মাবতীর কথামত সেই সোনার ঘট্ দুটি পূজা করে। মনসাদেবীর কৃপায় তাদের আর কিছুরই অভাব নেই, ধনে-জনে তাদের বাড়ী হয়ে উঠেছে পরিপূর্ণ। দিন দিন তাদের ঐশ্বর্য বেড়েই চলেছে।

এই সংবাদ ক্রমে ক্রমে উঠল গিয়ে চাঁদ-সওদাগরের স্ত্রী সুনুকার কানে। সুনুকা আর থাকতে না পেরে নিজের চোখে জালু-মালুর ঐশ্বর্য দেখবার জন্যে দোলায় চড়ে' একদিন হাজির হলেন তাদের বাড়ীতে।

বাস্তবিকই দুটি ভাইয়ের ঐশ্বর্য দেখে সুনুকার তো চক্ষুস্থির! গরীব জেলে তারা, নদীতে মাছ ধরে' খায়, তাদের এত ধনসম্পত্তি হলো কি করে'?

রাণী তাদের প্রশ্ন করলেন, "ওহে জালু-মালু, তোমাদের এই অতুল ঐশ্বর্য হোলো কি করে'? তোমরা ছিলে গরীব জেলে, নদীতে মাছ ধরে' তোমাদের কোনোরকমে সংসার চলত। আজ একী ব্যাপার দেখছি। তোমাদের যে এত ধন-দৌলত হবে—তা কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারে নি। ব্যাপার কি বল তো? রাতারাতি কোনো পরশ-পাথরের সন্ধান পেয়েছ কি?"

জালু-মালু তাঁকে খুব ভক্তির সঙ্গে সোনার ঘট্ দুটি দেখিয়ে উত্তর্ দিল, "আমরা এই ঘটে রোজ রোজ দেবী পদ্মাবতীর পূজা করি। তাঁরই আশীর্বাদে আমাদের এই ঐশ্বর্য হয়েছে।"

সোনার ঘট্ দুটি দেখে আর জালু-মালুর কথা শুনে সুনুকা তো অবাক্। তিনি তাদের কাছ থেকে একটি ঘট্ চেয়ে বসলেন। রাণী বল্লেন, "একটি ঘট্ আমাকে দিতে হবে।"

জালু-মালু বল্লে, "আপনি অন্য কিছু নিয়ে যান, এ ঘট্ আমরা কিছুতেই দিতে পারি না। আমাদের ক্ষমা করুন।"

জালু-মালু তো কিছুতেই ঘট্ দিতে চায় না, শেষে অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে সুনুকা তাদের কাছ থেকে একটি ঘট্ নিয়ে বাড়ী চলে' এলেন।

বাড়ীতে ঘট্ এনে সুনুকা দেবী ভক্তির সঙ্গে ঘট্‌স্থাপন করে' ষোড়শোপচারে পদ্মাবতীর পূজা করতে আরম্ভ করে দিলেন। রাণীর পূজায় তুষ্ট হয়ে নাগ-মাতা মনসাদেবী এসে তাঁকে দেখা দিলেন আর আশীর্বাদ করলেন।

এসব ব্যাপার কিন্তু চন্দ্রধর জানেন না। কিন্তু একদিন তাঁর কানে গেল তাঁর স্ত্রী অন্তঃপুরে গোপনে মনসার পূজা করছেন। এই কথা কানে যাওয়ামাত্র চাঁদ-সওদাগর ছুটে এলেন তাঁর সেই হেমতালের লাঠি ঘুরিয়ে। দূর থেকে দেখতে পেলেন, রত্ন-সিংহাসনের উপর রয়েছে তাঁর শত্রু পদ্মার আসন। রত্ন-সিংহাসনের উপর পদ্মাদেবী বসে' আছেন, আর সুনুকা তাঁর পূজা করছেন।—আর যায় কোথায়! দাঁতে দাঁত ঘষে', চোখ লাল করে' চাঁদ ছুটে এলেন পাগলের মত। এসে গালাগালি করে' রাণীকে বল্লেন, "ছি ছি, তোমার লজ্জা নেই! তুমি আমার স্ত্রী হয়ে গোপনে গোপনে আমারই শত্রুর পূজা করছ! এই কথা যদি বাইরে প্রকাশ পায়, তবে আমার

সমস্ত মানসম্মান ঘুচে যাবে, সকলের কাছে আমার মাথা হেঁট হয়ে যাবে। ছি ছি, কি লজ্জার কথা!"

চন্দ্রধরের কথা শুনে সুনুকা প্রতিবাদ করে' বল্লেন, "যাঁর কৃপায় আমাদের সুখ-ঐশ্বর্য বৃদ্ধি পাবে—শান্তি-আনন্দ বাড়বে—কল্যাণ হবে—তাঁকে আমি শত্রু বলে' ভাবতে পারি না। তুমি এরকম অন্যায় কথা বলছ কেন?"

সুনুকার কথা শুনে রাগে চন্দ্রধরের মাথা গরম হয়ে গেল। তিনি আর কোনো কথা না বলে' হেমতালের লাঠি নিয়ে মনসাদেবীকে তাড়া করলেন। পার্বতীর দেওয়া হেমতাল-লাঠি, বড় সোজা অস্ত্র নয়! প্রাণভয়ে পদ্মাদেবী দৌড়াতে লাগলেন। দূর থেকে চাঁদ-সওদাগর তাঁকে লাঠি ছুড়ে মারলেন। লাঠি গিয়ে লাগল পদ্মাবতীর শরীরে। তিনি খুব ব্যথা পেলেন। শেষে বন্ধু নেতার সাহায্যে পদ্মাবতী পালিয়ে বাঁচলেন।

পদ্মা তো পালালেন, এদিকে চাঁদ-সওদাগর লাঠির ঘায়ে তাঁর ঘট্ ভেঙে, পূজার বেদী চুরমার করে' তবে কিছুটা শান্ত হলেন। রাণী সুনুকাকেও এই জন্যে রীতিমত প্রায়শ্চিত্ত করতে হোলো।

চন্দ্রধরের ছয় পুত্র বধ

চন্দ্রধরের কাছ থেকে অপমানিত হয়ে পদ্মার আর দুঃখের অন্ত নাই! যেমনি হোলো তাঁর দুঃখ, তেমনি হোলো রাগ। তিনি কেঁদে কেঁদে মনের দুঃখে সহচরী নেতাকে বলতে লাগলেন, "আমার সমস্ত গর্ব চূর্ণ হোলো! দেবতাদের মাঝে আমার যে অহঙ্কার ছিল, একজন সামান্য মানুষ কিনা সেই অহঙ্কার ঘুচিয়ে দিল। পৃথিবীতে এসে আমার গর্ব খর্ব হয়ে গেল। চণ্ডিমাতার কানে যদি এই সংবাদ যায়, তবে আমার আর লজ্জার সীমা-পরিসীমা থাকবে না। এর যদি প্রতিশোধ না নিতে পারি তবে আমার মনসা নামই বৃথা : চন্দ্রধর যে কত বড় শক্তিধর—তা এবার বুঝে নেব। কয়েকটা সাপ মেরে সে নিজেকে বড়ই শক্তিমান্ মনে করছে। ভারী দেমাক হয়েছে তার। মনসাদেবীকে অপমান করার ফল এইবার হাতে হাতে পাবে সে।"

নেতা পরামর্শ দিলেন, "এক কাজ কর পদ্মা, চাঁদের ছয়টি ছেলে আছে, তাদের তুমি বধ কর। চাঁদ-সওদাগর আচ্ছা জব্দ হবে।"

নেতার কথা শুনে পদ্মার মন খুশীতে ভরে' উঠল, প্রতিহিংসার আগুন দাউ দাউ করে' জ্বলে উঠল তাঁর মনে। সাপের সেরা সাপ ছিল পাণ্ডুনাগ। তিনি তখনি তাকে ডেকে পাঠালেন।

সাপ এসে তাঁর সামনে হাজির হতেই তিনি বল্লেন, "তুমি শীগ্‌গির

করে' চম্পক-নগরে যাও। সেখানে চাঁদ-সওদাগরের ছয়টি ছেলে আছে, তাদের বধ কর। আমার এই আদেশ পালন করতে বিন্দুমাত্র দেরী কোরো না।"

দেবীর আজ্ঞা পেয়ে পাণ্ডুনাগ করল কি জানো? সে তৎক্ষণাৎ চম্পাক-নগরে এসে হাজির হোলো। তারপর অতি গোপনে চাঁদের বাড়ীতে প্রবেশ করল।

বাড়ীর বাগানে চাঁদের ছয়টি ছেলে খেলা করছিল। পাণ্ডুনাগ মাছির রূপ ধারণ করে' উড়ে গিয়ে তাদের মাথার ব্রহ্মতালুতে কামড় দিল। বিষের জ্বালায় অস্থির হয়ে চীৎকার করতে করতে চাঁদের ছয়টি ছেলেই মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়ল।

তাদের চীৎকার শুনে প্রহরীরা সবাই দৌড়ে এলো, এসে দেখে—হায় হায়, তাদের প্রভু-পুত্রেরা সবাই সাপের বিষে মরে' পড়ে' আছে! তৎক্ষণাৎ তারা ছুটে গিয়ে প্রভুকে এই দুঃসংবাদ দিল।

পুত্রদের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে সুনুকা মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়লেন, আর বারবার চন্দ্রধরকে মন্দ বলতে লাগলেন, "হায় হায়, তুমি মনসাকে অপমান করে' কি কুকর্মই করলে! আজ তুমি নির্বংশ হলে, তোমার পাপের ফল হাতে হাতে পেলে।"

সুনুকার কথা শুনে চাঁদ-সওদাগর গর্জন করে' উঠলেন, "কী, মনসার এত বড় আস্পর্ধা, আমার পুত্রদের সে এইভাবে গোপনে মেরে গেল! কিন্তু তোমাকে বল্‌ছি সুনুকা, আমাকে হিংসা করে' সে কিছুই করতে পারবে না। আমি এখনি মহাজ্ঞান-বিদ্যার বলে ছেলেদের বাঁচিয়ে তুলব। দেখি তোমাদের মনসা বড় না আমার বিদ্যা বড়।"

এই বলে' সওদাগর বাগানে গিয়ে মন্ত্র পড়ে' ছেলেদের মুখে জলের

ছিটা দিতে লাগলেন। মহামন্ত্রের প্রভাবে একটি একটি করে’ তাঁর ছয় ছেলেই চোখ মেলে উঠে বসল। সবাই আবার বেঁচে উঠল।
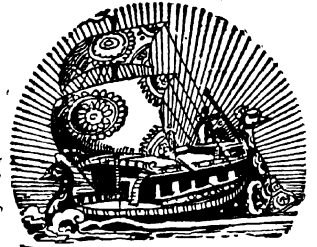
পুত্রদের আবার ফিরে পেয়ে সুনুকার তো আর আনন্দের সীমা নেই! তিনি শোক ত্যাগ করে’ হাসিমুখে পুত্রদের আদর করতে লাগলেন। চাঁদসওদাগর মনের সাধে মনসাদেবীকে গালাগালি করতে লাগলেন আর সকলকে জানিয়ে দিলেন,—কেউ আর মনসার নাম পর্যন্ত উচ্চারণ করতে পারবে না!

চাঁদের কাছে হেরে গিয়ে পদ্মাদেবীর তো অপমানে মুখ চূণ! তিনি কি করবেন ঠিক করতে পারছেন না। মহা ভাবনায় পড়ে’ গেলেন মনসাদেবী!

তখন নেতা বল্লেন, “এক কাজ কর, চন্দ্রধরের মহাজ্ঞান তুমি হরণ করে’ নিয়ে এসো। তা হলেই সওদাগর জব্দ হবে, তোমারও অপমানের প্রতিশোধ নেওয়া হবে।”

মহাজ্ঞান হরণ

চাদ-সওদাগরের কাছে এই ভাবে হার মেনে পদ্মাদেবীর মন অত্যন্ত খারাপ হয়ে গেল। তখন নেতা বল্লেন, “আমার পরা-মর্শ শোনো পদ্মা। সুনুকার কনকা নামে এক ভগ্নী আছে। তুমি তার রূপ ধারণ করে’ চাঁদের অন্তঃপুরে যাও, তারপর কৌশলে চাঁদের মহাজ্ঞান-বিদ্যা হরণ করে নিয়ে এসো।”

নেতার পরামর্শে পদ্মাবতী সুনুকার বোন কনকার রূপ ধারণ করে’ হাজির হলেন চাঁদ-সওদাগরের অন্তঃপুরে।

সুনুকা তাঁকে দেখে নিজের বোন বলেই মনে করলেন, মনসার ছদ্মবেশ ধরতে পারলেন না। মহাসমাদরে তাঁকে ঘরে নিয়ে গিয়ে আদর-আপ্যায়ন করতে লাগলেন। অনেক দিন পর বোনের সঙ্গে দেখা হয়েছে তাই তাঁর স্ফূর্তির আর শেষ নেই। দু’জনে পাশাপাশি বসে’ সুখ-দুঃখের গল্প করতে লাগলেন।

কনকার রূপ বড় সুন্দর, মুখখানা ঢলঢলে পদ্মের মতই অপরূপ। সমস্ত শরীর দিয়ে যেন রূপের ঝর্ণা ঝরে’ পড়েছে—যে দেখে সেই অবাক্ হয়ে চেয়ে থাকে। মনসার কৌশল কেউ ধরতে পারল না।

চাঁদ-সওদাগর ঘরে ঢুকেই কনকার রূপ দেখে মুগ্ধ হলেন,—এমন ভুবন-মোহন চেহারা তাঁর আর চোখে পড়েনি। মেয়ে নয় যেন স্বর্গের কোনো দেবী। তিনি তাঁকে চিনতেই পারলেন না। শেষে স্ত্রীর

কাছে যখন পরিচয় পেলেন যে এই সুন্দরী মেয়েটি সনুকার বোন কনকা, অর্থাৎ তাঁর নিজের শালী তখন আনন্দে তাঁর বুক ভরে' উঠল।

চাঁদ-সওদাগরের সঙ্গে কনকার আলাপ বেশ জমে' উঠল। স্বয়ং মনসাদেবী যে তাঁর শালীর বেশে এসেছেন, এ কথা চন্দ্রধর ঘুণাক্ষরেও টের পেলেন না। গল্পগুজব আমোদ-প্রমোদে তাঁদের দিন বেশ সুখেই কাটতে লাগল।

একদিন কথায় কথায় কনকা চাঁদ-সওদাগরের কাছে তাঁর মহাজ্ঞান-বিদ্যার কথা জিজ্ঞাসা করলেন।

চাঁদ তাঁকে খুবই ভালবেসে ফেলেছেন; কনকার কোনো কথা উপেক্ষা করবার শক্তি আর তাঁর ছিল না। তাই তাঁর অনুরোধ ঠেলতে না পেরে অতি গোপনীয় দুর্লভ মহাজ্ঞান-মন্ত্র ছদ্মবেশী মনসার কাছে প্রকাশ করে' ফেল্লেন। এই মন্ত্র কারুর কাছে প্রকাশ করলে মন্ত্রের গুণ চলে' যেত।

ব্যস্, আর কি! পদ্মাদেবীর কার্যসিদ্ধি হয়েছে। গুপ্তমন্ত্র শুনেই মুখ ধোয়ার নাম করে' মনসাদেবী বাইরে চলে' এলেন। সেখানে আগে থেকেই নেতা হংস-রথ নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন। মনসাদেবী বাইরে আসামাত্র হংস-রথে উঠে বসলেন,—আর তাঁকে পায় কে!

শূন্য থেকে চাঁদ-সওদাগরকে ডেকে পদ্মাদেবী বল্লেন, "ওরে সওদাগর, আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়েছে। আমি তোর শালী কনকা নই, আমি হচ্ছি দেবী মনসা। তোর মহাজ্ঞান-বিদ্যা আমি কৌশলে হরণ করেছি। এইবার তোকে আমি উচিত শিক্ষা দেব, সবংশে তোকে আমি ধ্বংস করব। আমার সঙ্গে শত্রুতা করার মজা এবার বুঝবি।"

হায় হায় হায়। এতক্ষণে চাঁদ-সওদাগরের হুঁশ হোলো তিনি কী

সর্বনাশটাই করে' ফেলেছেন! পদ্মাবতী যে তাঁর শালী কনকার রূপ ধরে' এসে তাঁর মহাজ্ঞান-বিদ্যা হরণ করে' নিয়ে গেলেন!! তাঁকে ঠকিয়ে সম্পূর্ণ বোকা বানিয়ে দিয়ে গেলেন!!

চাঁদ-সওদাগর চোখে অন্ধকার দেখতে লাগলেন। তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়ে' কাঁদতে লাগলেন—"হায় হায়! আমি কি করলাম! কনকার রূপ ধরে' মনসা আমাকে ভোজবাজি দেখিয়ে গেল। আমার অমূল্য নিধি আমি হারালাম। আমি নিজের সর্বনাশ নিজে করলাম। এমন গুপ্ত মহামন্ত্র আমি মোহের বশে প্রকাশ করে' ফেল্লাম। হায় হায় হায়, অতি মূর্খ আমি!"

আকুল হয়ে চাঁদ-সওদাগর ছেলেমানুষের মত কেঁদে মাটিতে লুটাচ্ছেন, এমন সময় তাঁর স্ত্রী এসে তাঁকে অনেক সান্ত্বনা দিয়ে হাত ধরে' তুলে ঘরে নিয়ে গেলেন।

ধন্বন্তরি বধ

মহাজ্ঞান-মন্ত্র হারিয়ে চাঁদ-সওদাগর মণিহারা ফণীর মত আকুল হয়ে উঠলেন। কেবল চিন্তা করেন আর দীর্ঘ-নিশ্বাস ছাড়েন! শেষে স্থির করলেন, যা হবার তা হয়ে গেছে, মনসাকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে হবে। এর প্রতিফল সে পাবে নিশ্চয়।

চাঁদ-সওদাগর ঘরের সমস্ত পূজার জিনিসপত্তর ছুড়ে ফেলে দিলেন। গোবর দিয়ে ঘর পরিষ্কার করলেন, তারপর স্নান করে' প্রায়শ্চিত্ত করলেন, আর মনের আশ মিটিয়ে মনসাকে গালাগালি দিতে লাগলেন।

এদিকে চাঁদের গালাগালি শুনে অন্তরীক্ষ থেকে মনসাদেবী ভীষণ চটে' উঠলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁর নাগসৈন্য নিয়ে হাজির হলেন সওদাগরের সুন্দর বাগানে। সাপেদের উগ্র বিষের জ্বালায় বাগানে যারা ছিল, সবাই জ্বলে' পুড়ে মরে' গেল।

এই খবর পেয়ে ছুটে আসলেন চাঁদ-সওদাগর আর তাড়াতাড়ি তাঁর মহাজ্ঞান-মন্ত্র আওড়াতে লাগলেন। কিন্তু এবার তাঁর মন্ত্র বিফল হোলো, কেউ আর বেঁচে উঠল না।

বৈদ্যের প্রধান ছিলেন ধন্বন্তরি। তাঁর ক্ষমতা ছিল অসীম। চাঁদ-সওদাগর অবিলম্বে তাঁকে ডেকে পাঠালেন। ধন্বন্তরি এসে বাগানের সকলকে

এই ব্যাপার দেখে পদ্মাবতীর তো আর লজ্জার শেষ নেই। ক্ষোভে দুঃখে তিনি নেতাকে বল্লেন, "মহাজ্ঞান হরণ করেও চাঁদকে ভালোমত শিক্ষা দিতে পারলাম না। এবারও আমায় হার মানতে হোলো। দুষ্টু ধন্বন্তরি আমার সাধে বাদ সাধল। সব নিষ্ফল করে' দিল।"

এইবার মনসাদেবীর রাগ পড়ল গিয়ে ধন্বন্তরির উপর। তিনি স্থির করলেন নাগ-সৈন্য নিয়ে ধন্বন্তরিকে বধ করবেন। ধন্বন্তরিকে বধ করা সহজ কথা নয়।

নেতা বল্লেন "তক্ষকের পরামর্শ ছাড়া ধন্বন্তরিকে বধ করা সম্ভব হবে না। তুমি তক্ষকের কাছে গিয়ে তাকে একথা জানাও।"

পদ্মাবতী তখনি হাজির হলেন তক্ষকের কাছে। তাঁর মুখে সমস্ত কথা শুনে তক্ষক বল্লে, "দেবি, তুমি চিন্তা কোরো না, আমি যে-কোনো উপায়ে হোক ধন্বন্তরিকে বধ করব। ধন্বন্তরির মৃত্যুর উপায় একমাত্র ধন্বন্তরিই জানে। আমি কৌশল করে' সে উপায় জেনে নেব।"

তারপর তক্ষক যোগবলে একটি সুন্দরী মেয়ের সৃষ্টি করল। মেয়েটির রূপ দেখলে চোখ যেন জুড়িয়ে যায়। এই মেয়েটিকে তক্ষক ধন্বন্তরির কাছে পাঠিয়ে দিল। তার সৌন্দর্য দেখে ধন্বন্তরি মুগ্ধ হয়ে গেলেন। এত রূপ তিনি জীবনে কখনও দেখেননি।

এই মেয়েটি অল্প সময়ের মধ্যেই ধন্বন্তরির সঙ্গে ভাব জমিয়ে ফেল্ল, তারপর নানা কথাবার্তায় জেনে নিল তাঁর মৃত্যুর উপায়। ধন্বন্তরি বল্লেন, "তক্ষক যদি আমার ব্রহ্মতালুতে কামড়ান, তবেই আমার মৃত্যু হবে। তা ছাড়া অন্য কোনো ভাবেই আমার মৃত্যু হতে পারে না।"

তারপর আর কথা কি!—মেয়েটি এসে তক্ষককে ধন্বন্তরির মৃত্যুর উপায়
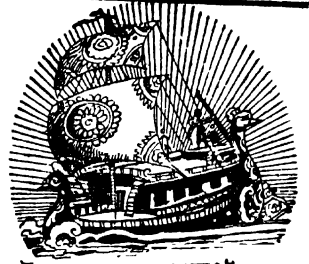
বলে’ দিল, আর তক্ষকও মনের আনন্দে নাচ্‌তে নাচ্‌তে গিয়ে ধন্বন্তরির ব্রহ্মতালুতে দিল মরণ-কামড়। ভগবানের নাম করতে করতে বৈদ্যের প্রধান ধন্বন্তরি মৃত্যুর কোলে ঢলে’ পড়লেন।

এই খবর পেয়ে শিষ্যেরা সবাই এসে জড় হলেন। সাপের বিষে গুরুদেবের মৃত্যু হয়েছে,—কি ভাবে তাঁর দেহ সৎকার করা যায় শিষ্যদের মধ্যে তাই নিয়ে গুরুতর সমস্যা দেখা দিল।

কেউ বল্লেন, “দেহটা পুড়িয়ে ফেলাই ভালো।”

কেউ পরামর্শ দিলেন, “দেহটা মাটিতে পুঁতে ফেলা যাক্।”

কেউ বিধান দিলেন, “দেহটা জলে ভাসিয়ে দেওয়া হোক্।”

শেষকালে সকলে পরামর্শ করে’ গুরুদেবের শরীর দুই অংশে ভাগ করে’ —এক অংশ মাটিতে পুঁতে ফেল্লেন, বাকী অংশ চিতায় দাহ করলেন।

আবার ছয় পুত্র বধ

চাঁদ-সওদাগরের উপর মনসাদেবীর রাগ আর মেটে না। তিনি চন্দ্রধরকে ভালো করে' জব্দ করবার জন্যে উঠে পড়ে' লেগে গেলেন। তিনি এইবার তাঁর নাগ-সৈন্য নিয়ে চল্লেন চম্পক-নগরে।

অনন্ত, বাসুকি প্রভৃতি সাপ অতি বিষাক্ত আর সাংঘাতিক। দেখতেও তারা অতি ভয়ঙ্কর। তাদের সঙ্গে নিয়ে পদ্মাবতী চম্পক-নগরে উপস্থিত হলেন। চাঁদের ছয়টি ছেলে বাগানে খেলা করছিলেন, মনসাদেবী তাঁদের বধ করবার জন্যে সাপেদের আদেশ দিলেন।

সাপেরা তখন মনসাদেবীকে বল্লে, "দেবি, আমরা যদি আমাদের এই বড় বড় শরীর নিয়ে ওদের আক্রমণ করি, তবে সবাই আমাদের দেখে ফেলবে, আর পিটিয়ে আমাদের মেরে ফেলবে। চাঁদ-সওদাগরের সব ওস্তাদ লাঠিয়ালের দল আশেপাশেই রয়েছে।"

মনসাদেবী বল্লেন, "আচ্ছা, তোমরা এক কাজ কর। এভাবে গিয়ে কাজ নেই, তোমরা সবাই মাছির রূপ ধরে' ওদের গিয়ে কামড়াও। কেউ টের পাবে না।"

দেবীর আদেশ পেয়ে ছয়টি ভয়ঙ্কর বিষাক্ত সাপ মাছির রূপ ধারণ
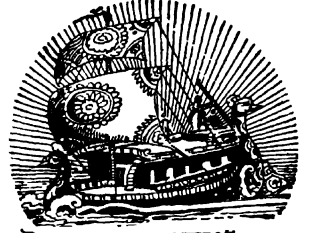
করে' চাঁদ-সওদাগরের ছয়টি পুত্রের মাথার তালুতে কামড় দিল। সাপের কামড় খেয়ে ছয় ভাই চীৎকার করে' মাটিতে ঢলে' পড়লেন। বাগানে যারা অনুচর ছিল তারা কিছু বুঝতে না পেরে ভীষণ রকম ভয় পেয়ে চাঁদকে গিয়ে এই দুঃসংবাদ দিল।

এই খবর পেয়ে চাঁদ-সওদাগর বুঝতে পারলেন, এ নিশ্চয়ই মনসাদেবীর কীর্তি। তিনি রাগে কাঁপতে কাঁপতে হেমতালের লাঠি নিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এলেন বাগানে। এসে পুত্রদের দুরবস্থা দেখে হাহাকার করতে কয়তে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন।

এই সুযোগে পদ্মাবতী তাঁর নাগ-সৈন্য নিয়ে সরে' পড়লেন।

দেখতে দেখতে এই খবর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। অন্তঃপুরে সনুকা এই দুঃসংবাদ পেয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। জ্ঞান হলে তিনি বুক-ফাটা চীৎকারে আকাশ-বাতাস ভরিয়ে তুল্লেন। আর তাঁর পুত্রবধূদের তো কথাই নেই! তাঁদের অবস্থা দেখলে অতি বড় পাষণ্ডেরও চোখে জলের বান ডেকে যায়।

আগেই বলেছি, এ সবই যে পদ্মাবতীর কীর্তি, তা বুঝতে চাঁদ-সওদাগরের বাকি রইল না। মনসাদেবীর উপর ঘৃণায় তাঁর মন ভরে' উঠল।

চাঁদ-সওদাগর তখন রাজ্যের বড় বড় বৈদ্য আর ওঝাদের ডেকে আনলেন। কিন্তু কোনোই ফল হোলো না। কেউ-ই আর তাঁর ছেলেদের বাঁচাতে পারল না।

তখন চন্দ্রধর স্থির করলেন, মনসার উচ্ছিষ্ট এই মৃতপুত্রদের জলে ভাসিয়ে দেবেন।

সওদাগরের আজ্ঞায় তাঁর অনুচরেরা তখন সুন্দর একটি ভেলা প্রস্তুত করল।

● আবার ছয় পুত্র বধ ●

চন্দ্রধর তখন ছেলেদের স্নান করিয়ে ভালো-ভালো পোষাকে মনের মত করে' সাজিয়ে, ভেলার উপর ছয়টি সুন্দর বিছানা পেতে তাঁদের শুইয়ে দিলেন। তারপর বিধিমত ব্রাহ্মণদের সুবর্ণ দান করে' ভেলা জলে দিলেন ভাসিয়ে।

এদিকে নদীর স্রোতে তর্ তর্ করে' ভেসে চল্ল ভেলাখানি। কিছুদিন পরে ভেলাখানি এসে সমুদ্রের মধ্যে পড়ল।

এখন, সমুদ্রের ধারে বাস করত সরুয়া নামে এক রাক্ষসী। সে ভেলার উপর ছয়টি মৃতদেহ দেখে জলে ঝাঁপ দিয়ে ভেলাটি তীরে তুলে আনল। মৃতদেহগুলি দেখে তার আর আনন্দের সীমা নেই!

রাক্ষসী তখন করল কি, মৃতদেহগুলিকে এনে রৌদ্রে শুকিয়ে ঘরের ভিতর রেখে দিল। তারপর তার স্বামীকে বল্ল, "আর একটি মৃতদেহ যদি পাই তবে এই সাতজনের অস্থি দিয়ে চমৎকার মাল-ঘণ্ট রেঁধে খাব। অনেকদিন এই মাল-ঘণ্ট খাই নাই। বাপের বাড়ীতে মা আমাকে রাঁধতে শিখিয়েছিলেন। একবার এই ঘণ্ট খেলে, আর অন্য কিছু মুখে রোচে না!" বলতে বলতে তার মুখ দিয়ে লালা ঝরতে লাগল।

বাণিজ্যের পরামর্শ

এইভাবে দিন যায়।—

একদিন চাঁদ-সওদাগর ভোরবেলা উঠে প্রাতঃকৃত্য শেষ করে’ সাজগোজ সেরে সভায় হাজির হলেন। চন্দ্রধর সওদাগর হলেও রাজার মতই তাঁর চালচলন ছিল। তাঁর মন্ত্রী, পাত্র-মিত্র সবই ছিল। জাঁকজমকের অন্ত ছিল না।

চন্দ্রধর সভায় এসে সকলকে উপস্থিত দেখে খুসী হয়ে উঠলেন। তখন তিনি সভাসদ্‌দের সঙ্গে পরামর্শ করতে লাগলেন কি ভাবে আরো বেশী ধন উপার্জন করা যায়।

চন্দ্রধরের সভায় ছিলেন মস্ত বড় এক পণ্ডিত, নাম তাঁর শ্রীধর। তিনি রাজার প্রশ্ন শুনে বলতে লাগলেন, “হে সওদাগর দুই ভাবে ধন উপার্জন হতে পারে। পিতৃরাজ্য শাসন করলে ধনলাভ হয় আর বাণিজ্য করলে প্রচুর অর্থলাভ হয়।”

শ্রীধর পণ্ডিতের কথা শুনে চন্দ্রধর স্থির করলেন তিনিও বাণিজ্যে যাবেন। তাঁর বাবা কোটীশ্বর তেরটি ডিঙ্গা নিয়ে বাণিজ্য করতে গেছিলেন, তারপর বহু অর্থ উপার্জন করে’ দেশে ফেরেন। লঙ্কায় গিয়ে বাণিজ্য

করে’ তিনি রাজার মত ঐশ্বর্য লাভ করেন। চাঁদ-সওদাগর ঠিক করলেন তিনিও আবার লঙ্কায় যাবেন।

তাঁর পৈতৃক আমলের তেরখানি বাণিজ্যের ডিঙ্গা আছে, আর একখানি ডিঙ্গা তৈরি করে’ এই চৌদ্দখানা ডিঙ্গা নিয়ে তিনি লঙ্কায় যাবেন।

চাঁদের কথা শুনে শ্রীধর পণ্ডিত বল্লেন, “বৎস, তুমি বাণিজ্যে যাবে এ তো অতি সুখের কথা। কিন্তু এ বিষয়ে একটু চিন্তার কথা আছে। স্বয়ং পদ্মাদেবী তোমার শত্রু হয়ে আছেন, এ অবস্থায় তোমার বাণিজ্যে যাওয়াটা আমি নিরাপদ্ বলে’ মনে করি না। তিনি সব সময়েই তোমাকে বিপদে ফেলতে চেষ্টা করবেন।”

শ্রীধর পণ্ডিতের কথা শুনে চাঁদ-সওদাগর তাচ্ছিল্যের সুরে বল্লেন, “মনসাকে আমি ভয় করি না। তপস্যা করে’ ব্রহ্মার কাছ থেকে আমি বর চেয়ে নেব। আর তা ছাড়া—হর-পার্বতীর আশীর্বাদ আমি পেয়েছি—হেমতালের লাঠিও আমার কাছে আছে।”

তারপর সভাভঙ্গ করে’ চন্দ্রধর বাড়ী চলে’ এলেন। তারপর স্নান সেরে চাঁদ খাওয়া-দাওয়ার পর শ্রীদুর্গাকে স্মরণ করে’ যোগবলে ব্রহ্মার কাছে উপস্থিত হলেন, আর জোড়হাতে তাঁর স্তব করতে আরম্ভ করলেন।

তাঁর স্তবে তুষ্ট হয়ে ব্রহ্মা তাঁর মনের বাসনা জানলেন, তারপর বল্লেন, “ওহে চাঁদ-সওদাগর, তুমি মিথ্যা ভয় পেও না। তোমার কাছে পার্বতীর দেওয়া অস্ত্র হেমতালের লাঠি আছে। এই অস্ত্র সঙ্গে থাকতে তোমার সাপের কোনো ভয় নেই। শোনো, তোমাকে আর একটি পরামর্শ দিচ্ছি। কাঠের সেরা হচ্ছে মন-পবনের কাঠ, সেই কাঠ দিয়ে তুমি আর একখানি ডিঙ্গা তৈরি কর। এ বিষয়ে তোমাকে স্বয়ং বিশ্বকর্মা সাহায্য করবেন।

এই ডিঙ্গার নাম দিও 'মধুকর'। এই মধুকর ডিঙ্গায় তুমি বাণিজ্যে যেও, তোমার মনের ইচ্ছা পূর্ণ হবে,—আমি এই বর দিচ্ছি।"
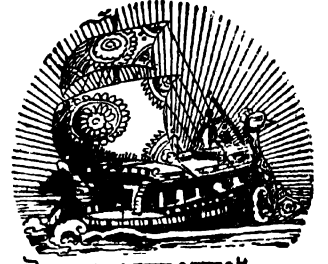
ব্রহ্মার বর পেয়ে চাঁদ-সওদাগর অমনি ছুটলেন কৈলাসের দিকে। সেখানে শিবকে প্রণাম করে' বল্লেন, "বাবা আশুতোষ, আমি বাণিজ্যে যেতে চাই। একবার তুমি আর মা ভগবতী আমাকে আশীর্বাদ করেছিলে—আবার তোমাদের কাছে আশীর্বাদ ভিক্ষা করতে এসেছি। পদ্মাবতী আমার প্রবল শত্রু। দেখ বাবা, যেন আমার বাণিজ্য সেরে আমি নিরাপদে বাড়ী ফিরতে পারি। মনসা যেন আমার কোনো অনিষ্ট না করতে পারে। তুমি আমাকে বাণিজ্য-যাত্রায় অনুমতি দাও।"

চাঁদ-সওদাগরের কথায় মহাদেব তুষ্ট হয়ে তাঁকে আবার আশীর্বাদ করে' বাণিজ্য-যাত্রায় অনুমতি দিলেন। শিবের অনুমতি নিয়ে আনন্দে দিশেহারা হয়ে চন্দ্রধর বাড়ী ফিরে এলেন।

মধুকর ডিঙ্গার কথা

চন্দ্রধরের রাজ্যে সেরা-ছুতোর ছিল মাণিক্য সূত্রধর। চাঁদ-সওদাগর তাকে ডেকে মধুকর-ডিঙ্গা তৈরি করবার আদেশ দিলেন। মন-পবনের কাঠ দিয়ে এই ডিঙ্গা তৈরি করতে হবে।

এদিকে পদ্মাদেবী অন্তরাল থেকে সমস্ত খবরই রাখছেন। তিনি করলেন কি, যে বনে মন-পবনের গাছ পাওয়া যায়, সেই বনের চারিধার নাগ-সৈন্য দিয়ে ঘিরে রাখলেন। শুধু তাই নয়, তাঁর আজ্ঞায় ভীষণ ভীষণ সব বাঘ এসে জড় হোলো সেই বনের মাঝে।

সওদাগরের ছুতোরেরা বনে মন-পবনের গাছ কাটতে এসে দেখে ভয়ঙ্কর ব্যাপার। সে-বনে প্রবেশ করে কার সাধ্য! চারধারে গিজ্ গিজ্ করছে অসংখ্য সব বিষাক্ত সাপ, আর হিংস্র বাঘের দল। তাদের ফোঁস্‌ফোঁসানি আর গর্জনের চোটে কানে তালা লাগে আর কি!

নিরাশ হয়ে তারা ফিরে এলো সওদাগরের কাছে, আর সমস্ত কথা খুলে বল্ল।

চন্দ্রধরের আর বুঝতে বাকি রইল না যে, এ সবই মনসাদেবীর কাণ্ড। কিন্তু, মনসাদেবীর কাছে তিনি কিছুতেই হার মানতে রাজি নন। যে কোনো প্রকারে হোক্ তাঁকে জব্দ করতেই হবে।

চাঁদ-সওদাগর তখন করলেন কি, ভক্তির সঙ্গে মা দুর্গাকে ডাকতে

লাগলেন আর তাঁর পূজা করতে লাগলেন। ভক্তের ডাকে স্থির থাকতে পারলেন না, এসে দেখা দিলেন।

দেবীর দেখা পেয়ে চাঁদ-সওদাগর হাত জোড় করে' গদ্‌গদস্বরে বল্লেন, 'মাগো কাত্যায়নী, আমাকে তুমি রক্ষা কর। মধুকর-ডিঙ্গা তৈরি করতে পারছি না! মন-পবনের কাঠ কাটতে গিয়ে ছুতোরেরা ভয় পেয়ে পালিয়ে এসেছে। সেখানে সব বড় বড় সাপ আর ভীষণ বাঘের দল তাদের বাধা দিচ্ছে। তুমি সহায় হও, মা! আমার ইচ্ছা পূর্ণ কর!"

দেবী দুর্গা চাঁদকে অভয় দিয়ে বল্লেন, "বৎস, আমার ভক্তের কোনো ভয় নেই। তোমার মধুকর-ডিঙ্গা অবশ্যই তৈরি হবে।" এই কথা বলেই দুর্গাদেবী বীর-হনুমানকে স্মরণ করলেন। স্মরণমাত্রেই হনুমান এসে উপস্থিত।

হনুমান আসতেই দেবী তাঁকে চাঁদ-সওদাগরকে সাহায্য করতে আদেশ দিলেন। তারপর চন্দ্রধরকে বল্লেন, "তুমি হেমতালের লাঠি নিয়ে হনুমানের সঙ্গে জঙ্গলে যাও, তোমার মঙ্গল হবে।" এই বলে' দেবী অদৃশ্য হয়ে গেলেন, আর চাঁদ-সওদাগরও বীর-হনুমানকে সঙ্গে নিয়ে হেমতালের লাঠি ঘুরিয়ে সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে হাজির হলেন সেই গভীর জঙ্গলে।

সেই জঙ্গলে গিয়ে বীর-হনুমান এমন হুঙ্কার ছাড়লেন যে, যেখানে যত বাঘ ছিল, তারা লেজ তুলে ছুটে পালাল যে যেদিকে পারে। আর হেমতালের গন্ধ পেয়ে সাপেরাও আস্তে আস্তে সরে' পড়ল।

বাস্, আপদ গেল ঘুচে। ছুতোরেরা মিলে তখন মন-পবনের গাছ কাটতে লাগল, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই পাহাড়ের মত প্রকাণ্ড সেই গাছ হুড়্‌মুড়্ করে' মাটিতে পড়ল।

গাছ তো কাটা হোলো, সেই কাটা গাছ আর কেউ নাড়াতে পারে না।

লক্ষ লক্ষ লোক মিলে ঠেলাঠেলি করে, কিন্তু একচুলও নড়ে না মন-পবনের গাছ।

এই ব্যাপার দেখে হনুমান তো হেসেই অস্থির। এই সামান্য কাজটা কেউ করতে পারছে না। তিনি তখন করলেন কি, তাঁর লেজে জড়িয়ে সেই পাহাড়ের সমান গাছটাকে তুলে এনে চন্দ্রধরের বাড়ী পৌঁছে দিলেন।

তারপর দেবী-দুর্গার আদেশে হাজির হলেন স্বয়ং বিশ্বকর্মা। বিশ্বকর্মাকে দেখে চাঁদ-সওদাগর তাঁকে অতি করুণভাবে অনুরোধ করলেন, "হে বিশ্বকর্মা আমার বাণিজ্যে যেতে বড়ই ইচ্ছা হয়েছে। তুমি আমাকে এই মন-পবনের কাঠ দিয়ে মধুকর-ডিঙ্গা তৈরি করে' দাও।"

বিশ্বকর্ম মস্ত বড় কারিগর। স্বর্গের যত বড় বড় বাড়ী, বিরাট বিরাট সভা—সব তাঁরি তৈরি। তিনি হলেন দেবতাদের রাজ্যের এক নিপুণ শিল্পী তাঁর অসাধ্য কাজ কিছু নাই।

চাঁদের কথায় বিশ্বকর্মা রাজি হলেন, আর অতি অল্পদিনের মধ্যেই সেই মন-পবনের কাঠ দিয়ে অতি সুন্দর, দেবতাদেরও দুর্লভ মধুকর-ডিঙ্গা তৈরি করে' দিলেন।

অনেক হাঙ্গামার পর ডিঙ্গা তৈরি হোলো। বিশ্বকর্মার তৈরি ডিঙ্গা, তার বুঝি আর তুলনা হয় না। চাঁদ-সওদাগরের বাবার ছিল তেরটি ডিঙ্গা, এখন হোলো এই মধুকর-ডিঙ্গা। সবসুদ্ধ হোলো চৌদ্দটি।

চন্দ্রধরের মনে আনন্দ আর ধরে না। তিনি অনুচরদের ডেকে এই চৌদ্দটি ডিঙ্গা সাজাবার আদেশ দিলেন।

অনুচরেরা প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিসপত্তর দিয়ে সাজিয়ে ফেল্ল।

চন্দ্রধর যাবেন লঙ্কায় বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে।

একদিন শুভদিন দেখে চাঁদ-সওদাগর চৌদ্দ ডিঙ্গা জলে ভাসিয়ে চণ্ডীর পূজা দিয়ে বাণিজ্য-যাত্রা করবার আয়োজন করলেন।

পণ্ডিতেরা শুভদিন শুভক্ষণ দেখে দিলেন। চাঁদ-সওদাগর তখন সকল দেবতাকে অতি ভক্তিভরে পূজা করলেন, আর মা দুর্গাকে সন্তুষ্ট করবার জন্যে নানা রকম বলিদান করলেন।

যখন তাঁর পূজা শেষ হয়েছে, এমন সময় হঠাৎ দেখা দিলেন পদ্মাদেবী। পদ্মাদেবী চাঁদ-সওদাগরকে ডেকে বল্লেন, "ওহে চাঁদ, তুমি অতি বদ্ধিমান। তুমি সকল দেবতাকেই পূজা করলে, কিন্তু আমার কোনো

পূজা করলে না কেন? আমি তোমার গুরুকন্যা। তুমি আমার পূজা কর, তোমার সমস্ত বিপদ্ দূর হবে। তোমার ছয়পুত্রকে আবার আমি বাঁচিয়ে দেব। আমার আশীর্বাদে তুমি অতুল সম্পত্তির অধিকারী হবে।”

পদ্মাবতীর কথা শুনে তাঁর প্রতি ভক্তি হওয়া তো দূরের কথা, চন্দ্রধর তেলে-বেগুনে জ্বলে' উঠলেন। কী, এত বড় আস্পর্ধা! শত্রুর পূজা করবেন চাঁদ-সওদাগর! মনসাদেবীকে চূড়ান্ত অপমান করে' হেমতালের লাঠি নিয়ে চাঁদ তাড়া করলেন তাঁকে। পদ্মাও বিশেষ অপমানিত ও অপ্রস্তুত হয়ে সরে' পড়লেন।

বাণিজ্য-যাত্রার সময় চন্দ্রধর সকলকে ডেকে নানা উপদেশ দিলেন। বন্ধুদের ডেকে বল্লেন, “যতদিন আমি ফিরে না আসি, ততদিন তোমরা সবাই রাজ্যের প্রতি নজর রেখো। আমার অবর্তমানে প্রজারা যেন কষ্ট না পায়।”

এই বলে' সকলকে বিদায় দিয়ে চাঁদ-সওদাগর শ্রীদুর্গার নাম করে' ডিঙ্গায় গিয়ে উঠলেন। সঙ্গে চল্লেন গুরু পুরোহিত আর ব্রাহ্মণের দল। সৈন্যসামন্তেরা সবাই সাজগোজ করে' গিয়ে ডিঙ্গায় উঠল।

যথাসময়ে চাঁদের আদেশে ডঙ্কা বাজিয়ে ডিঙ্গা ছেড়ে দেওয়া হোলো।

চৌদ্দ ডিঙ্গা ভেসে চল্ল মহাসমারোহে। আগে আগে চলেছে জাঁক-জমকে-ভরা মধুকর-ডিঙ্গা ঝল্‌মলে রঙীন্ নিশান উড়িয়ে। তার পিছনে চলেছে বিজয়াসাগর-ডিঙ্গা, তারপর সুগন্ধমাদন, চন্দ্রিমাবদন, শঙ্খচূড়, সুদানেত্তের ভানা, ছুটিমুটি, ভুবনমন্দির, পুণ্যের শরীর, হলবল শঙ্কা, আকাশিয়া ছাতা, গুয়ারেখী, গামারিয়া পাট আর মেলে—এই তেরটি ডিঙ্গা ছুটে চলেছে মধুকর-ডিঙ্গার পিছনে পিছনে।

কোনো ডিঙ্গায় আছে খাবারের ভাঁড়ার, কোনোটাতে কারখানা, কোনো ডিঙ্গায় অস্ত্রশস্ত্র,—এই ভাবে এক একটি ডিঙ্গা এক এক ভাবে সাজিয়ে নেওয়া হয়েছে।

নীচে টল্‌টলে জল, উপরে ঝল্‌মলে আকাশ। সুন্দর ফুর্‌ফুরে বাতাসে নানা-বর্ণের পাল উড়িয়ে ছুটে চল্ল চাঁদের চৌদ্দ ডিঙ্গার বহর উজান ঠেলে।

নতুন অভিযানের নেশায় যাত্রীরাও মেতে উঠেছে।

কোনো ডিঙ্গায় চলেছে খোশ-গল্প, কোনো ডিঙ্গায় সুরু হয়েছে গান-বাজনা। সকলের মনেই উল্লাস।

সাম্‌নের মধুকর-ডিঙ্গার ছাদের উপর ফরাস পেতে মখমলের তাকিয়ায় হেলান দিয়ে চাঁদ-সওদাগর দূরে দিগন্তের দিকে তাকিয়ে নতুন নতুন ঐশ্বর্যের স্বপ্ন দেখতে দেখতে চলেছেন।

লক্ষ্মীন্দরের জন্ম

চাঁদ-সওদাগর বাণিজ্য করতে বিদেশে চলে' গেলেন—এদিকে কিছুদিন পরেই রাণী সনুকার গর্ভে তাঁর একটি ফুলের মত সুন্দর ছেলে হোলো।

ছেলেটির রূপ যেন ফেটে পড়ছে! যে দেখে সেই অবাক্ হয়ে চেয়ে থাকে,—এমন সুন্দর শিশু বুঝি কেউ আর কোনদিন দেখেনি। কোনো দেব-শিশু বুঝি আজ শাপভ্রষ্ট হয়ে চাঁদের ঘরে জন্মগ্রহণ করেছে!

দৈবজ্ঞ, জ্যোতিষীরা শিশুর কোষ্ঠী আর ঠিকুজিবিচার করে' বল্লেন, "এই শিশুটি মহাভাগ্যবান্, শুধু বিয়ের পর বাসরঘরে একটি ফাঁড়া দেখা যায়। ঐ দিন তার সাপের ভয় আছে।"

এই কথা শুনে সনুকা তো চম্‌কে উঠলেন। চাঁদ-সওদাগর আর মনসাদেবী দু'জনে দু'জনের পরম শত্রু। কাজেই এই শিশুটির উপর যে মনসাদেবীর কোপ পড়বে তাতে আর আশ্চর্য কি? তাই তিনি শিশুটির ঐ ফাঁড়া কাটাবার জন্যে ভগবানের কাছে আকুল প্রার্থনা জানালেন।

বাস্তবিকই ছেলেটি মহাভাগ্যবান্ বলেই বোধ হচ্ছে। সনুকার আর আনন্দের সীমা নেই।

চাঁদ-সওদাগর দেশে ফিরে এসে শিশুটিকে দেখে যে কতদূর সুখী হবেন, এই ভেবেই সুনুকা আহ্লাদে অস্থির হয়ে উঠলেন। কিন্তু তবুও শিশুটির ফাঁড়ার কথা ভেবে তাঁর মনের মধ্যে মাঝে মাঝে খচ্ খচ্ করতে লাগল।

ছয় দিনে শিশুর ষষ্ঠীপূজা হয়ে গেল। শিশুর নামকরণ করা হোলো 'লক্ষ্মীন্দর'।

ক্রমে শিশু লক্ষ্মীন্দর বড় হয়ে উঠতে লাগলেন। রাণী সুনুকা তাঁর শিক্ষাদীক্ষার সমস্ত ব্যবস্থাই করলেন। তাঁকে নানা শাস্ত্র পড়াতে লাগলেন। রাজ্যের যত বড় বড় পণ্ডিত লক্ষ্মীন্দরের শিক্ষার ভার নিলেন।

ছেলেটির যেমন রূপ, তেমনি গুণ। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি নানা শাস্ত্রে নিপুণ হয়ে উঠলেন। রাজ্যের লোকের মুখে লক্ষ্মীন্দরের প্রশংসা আর ধরে না। সবাই বলে—"যেমনি বাপ তার তেমনি ব্যাটা!"

শিশুটির ফাঁড়ার কথা যখনই সুনুকার মনে হয় তখনই তাঁর মন বিষাদে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। বাড়ীর আত্মীয়-স্বজনেরা অভয় দিয়ে বলেন, "কিছু ভয় নেই সুনুকা! তোমার স্বামী মহাদেবের মহাভক্ত। তিনি নিশ্চয়ই তাঁর কল্যাণ করবেন। হর-পার্বতীর আশীর্বাদে তোমাদের সমস্ত অমঙ্গল দূর হয়ে যাবে।"

এইভাবে চম্পক-নগরে শিশু লক্ষ্মীন্দরকে নিয়ে সকলের দিন কাটতে লাগল।

———
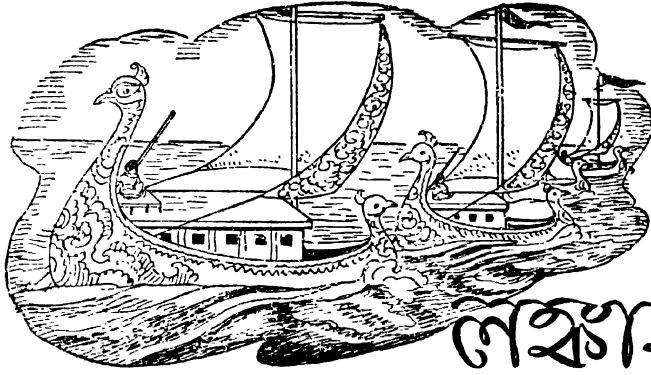
লঙ্কার পথে

চাঁদ-সওদাগরের চৌদ্দ ডিঙ্গা ভেসে চলেছে অকূল সমুদ্রে। পথে ঝড়-হওয়ায় চন্দ্রধর কিছুদিন কটকে বিশ্রাম করেছিলেন। দুর্যোগ কাটলে পর আবার তিনি লঙ্কার পথে চলেছেন সদলবলে।

দিন নাই, রাত নাই—ভেসে চলেছে তাঁর ডিঙ্গার সারি। পাকা মাঝি-মাল্লারা মনের আনন্দে নৌকা বেয়ে চলেছে।

বেশ নির্বিঘ্নেই পথ চলেছে সবাই, কিন্তু হঠাৎ একি কাণ্ড! কোথা থেকে সব রাক্ষুসে-কাঁকড়ার দল পালে পালে এসে চন্দ্রধরের ডিঙ্গা আক্রমণ করে' বসল।

বাস্‌রে বাস্‌, এক একটা কাঁকড়ার বিরাট-চেহারা দেখলে ভয়ে যেন মুখ শুকিয়ে যায়! এই কাঁকড়াগুলোর চেহারাও যেমন সাঙ্ঘাতিক, স্বভাবও তেমনি ভয়ঙ্কর। মুখের দু'ধারে অজগর সাপের মত বড় বড় দাঁড়া। মানুষের গন্ধ পেয়ে সবাই দলে দলে এসে চাঁদ-সওদাগরের ডিঙ্গাগুলিকে ঘিরে ফেল্ল।

হঠাৎ ডিঙ্গার গতি রোধ হওয়াতে চাঁদ-সওদাগর বিচলিত হয়ে উঠলেন। এত বড় কাঁকড়া তিনি জীবনে কখনো দেখেননি।

মাঝিরা বল্লে, "এই সমুদ্র রাক্ষুসে-কাঁকড়ার জন্যে বিশেষ বিখ্যাত। কোনো লোক সাহস করে' এই সমুদ্রের জলে নামে না। এটা কাঁকড়ার রাজত্ব।"

এই কথা শুনে চাঁদ-সওদাগর বল্লেন, "তোমরা শীগ্‌গির এর কোনো উপায় কর। এই সব মারাত্মক কাঁকড়াগুলোর আস্তানা ছেড়ে চট্‌পট্‌ ডিঙ্গিগুলো অন্যত্র সরিয়ে ফেল।"

কিন্তু এই ভয়ঙ্কর কাঁকড়ার আক্রমণে ডিঙ্গিগুলি আর এক চুলও এগুতে পারছে না। সবগুলি অচল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সারি সারি।

চাঁদ-সওদাগরের কথা শুনে মাঝিদের মধ্যে যে সর্দার কর্ণধার ছিল, সে একটা উপায় স্থির করল।

সে তখন অন্যান্য মাঝিদের ডেকে বল্লে, "এসো সবাই মিলে আমরা এক-সঙ্গে শিয়ালের মত চিৎকার জুড়ে দি।"

সর্দারের কথায় তখন সবাই মিলে একসঙ্গে 'হুক্কা-হুয়া' করে' শিয়ালের ডাক ডাকতে আরম্ভ করে' দিল।

কাঁকড়ার প্রধান শত্রু হচ্ছে শিয়াল। শিয়ালকে তারা বড়ই ভয় করে। হঠাৎ শিয়ালের ডাক শুনে কাঁকড়ার দল অস্থির হয়ে উঠল, আর তাড়াতাড়ি তারা যে যেখানে পারল পালাতে লাগল।

সুচতুর কর্ণধারের বুদ্ধি দেখে চাঁদ-সওদাগর তো মহা খুশী। তিনি মাঝির পিঠ থাপ্‌ড়ে তারিফ করে' বল্লেন, "সাবাস তোমার বুদ্ধি! দেশে গিয়ে আমি এজন্য তোমাকে বিশেষ সম্মান দেব।"

কাঁকড়ার আক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়ে আবার চল্লেন তাঁরা লঙ্কার দিকে। মাঝপথে সমুদ্রকূলে হরগৌরীর বাসর দেখে চাঁদ-সওদাগর ডিঙ্গা থামিয়ে ভক্তিভরে তাঁদের পূজা করলেন।

এই ভাবে আরো কিছুদূর এগিয়ে গেলে, এবার তাঁর চোখে পড়ল সমুদ্রের কূলে পদ্মাবতীর এক মন্দির।
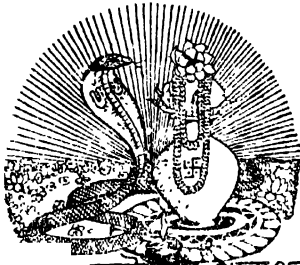
আর যায় কোথায়! তিনি তৎক্ষণাৎ মাঝিদের হুকুম দিলেন, "ডিঙ্গি কূলে ভিড়াও। আর সকলে লাঠি-সড়্‌কী নিয়ে আমার সঙ্গে ডাঙ্গায় নামো।"

এই আদেশ দেবার সঙ্গে সঙ্গে ডিঙ্গি কূলে ভিড়ানো হোলো। তখন তিনি সদলবলে গিয়ে মনসার মন্দির আক্রমণ করলেন।

তাঁর আদেশে তাঁর লোকজনেরা মন্দির ভেঙে চুরমার করে' ফেল্ল। বেদী ছুঁড়ে সমুদ্রের জলে ফেলে দিল।

তারপর মনের সাধে মনসাকে গালাগালি দিতে দিতে চাঁদ-সওদাগর ডিঙ্গায় এসে উঠলেন। পরম আনন্দে আর চরম তৃপ্তিতে তাঁর মন ভরে' উঠল।

এই ভাবে আরো কিছু দিন সমুদ্রে ভাসতে ভাসতে ক্রমে দূরে সিংহলের তটভূমি দেখা গেল। তাই দেখে সকলের আর আনন্দের শেষ নাই। মাঝি-মাল্লারা তীরে পেঁছাবার জন্য বায়ুবেগে ডিঙ্গা চালাতে লাগল।

সিংহল দেখবার জন্যে সবাই যেন আকুল হয়ে উঠল। মাটিতে পা দেবার জন্যে চাঁদ-সওদাগরও অস্থির হয়ে উঠলেন। অনেকদিন ধরে' জলে জলেই কাটছে।

অসীম সমুদ্রের মধ্যে গাছপালায় ঢাকা সিংহলের শস্য-শ্যামল দ্বীপ যেন ক্রমেই স্পষ্ট হতে স্পষ্টতর হয়ে উঠতে লাগল।

———

এত দিনে চাঁদ-সওদাগরের মনের সাধ পূর্ণ হোলো। তেরটি ডিঙ্গার সাথে তাঁর মধুকর-ডিঙ্গা এসে সিংহলের কূলে ভিড়ল একদিন সোনালী রোদে ভরা স্নিগ্ধ প্রভাতে।

দূর থেকে সিংহলের সৌন্দর্য দেখে চাঁদ-সওদাগর অবাক্ হয়ে গেলেন। চারিধারে সব রত্নময় পুরী সূর্যের আলোয় ঝল্‌মল্ করছে।

অদ্ভুত দেশ এই সিংহল! সেখানকার অধিবাসীরা সকলে, রাক্ষস, কিন্তু আকার অনেকটা মানুষের মত। নিয়মকানুনও অদ্ভুত রকমের। সেখানকার ঘোড়া আর হাতী দিয়ে জমি চাষ করা হয়।

চাঁদ-সওদাগরের লোকেরা সিংহলের ঘাটে পৌঁছে যখন তাঁর আদেশে মহা-আনন্দে জয়ডঙ্কা বাজাতে লাগল, তখন তেড়ে এলো সব বিকট বিকট মূর্তি। গায়ের রং তাদের ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। তালগাছের মত লম্বা লম্বা শরীর। মুখে আবার অদ্ভুত ধরনের দাড়ি। কানগুলো কুলোর মত,' চোখগুলো টক্‌টকে লাল।

হৈ হৈ করতে করতে তারা সব তেড়ে এলো দলে দলে। বল্লে "কে রে তোরা উজ্‌বুকের দল এসেছিস্ আমাদের দেশে? তোদের চেহারাগুলোও যেমন

মর্কটের মত, স্বভাবগুলোও তেমনি বিদ্‌ঘুটে। মত্‌লব কী তোমাদের বল্‌, নইলে এখনই তোদের খেয়ে সাবাড় করে' দেব।"

চাঁদ-সওদাগর তাদের অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে শান্ত করলেন। তিনি বল্লেন, "আমরা কোনো বদ্‌ মত্‌লব নিয়ে আসি নাই। আমরা তোমাদের রাজাকে খুব ভক্তি করি কিনা, তাই তাঁকে দর্শন করতে এসেছি। তাঁকে দর্শন করেই আমরা দেশের ছেলে দেশে ফিরে যাব!"

তারা যখন জানতে পারল এই বণিক্‌ তাদের রাজার দর্শনপ্রার্থী হয়ে এসেছে তখন তারা খুশী হয়ে রাজাকে সংবাদ দিল।

সিংহলের রাজার নাম চন্দ্রকেতু। তিনি বড়ই ধার্মিক আর ভালমানুষ।

তিনি যখন শুনলেন ভারতবর্ষ থেকে এক সওদাগর তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন, তখনি তিনি তাঁকে সসম্মানে ও সমাদরে রাজসভায় আনতে পারিষদদের হুকুম দিলেন।

চাঁদ-সওদাগর সভায় আসতেই চন্দ্রকেতু সিংহাসন থেকে নেমে তাঁর সঙ্গে কোলাকুলি করলেন আর একই সিংহাসনে দু'জনে পাশাপাশি বসলেন।

চাঁদের সঙ্গে শ্রীধর পণ্ডিত প্রভৃতি যে-সব ব্রাহ্মণ এসেছিলেন তাঁদেরও যথাযোগ্য আসনে বসবার ব্যবস্থা করে' দেওয়া হোলো।

চাঁদ-সওদাগরের পরিচয় পেয়ে রাজা চন্দ্রকেতু খুব সন্তুষ্ট হলেন। রাক্ষসদের দেশে মানুষ এসেছে এই সংবাদ পেয়ে রাজ্য ভেঙে সবাই এসে জুটল রাজসভায়। মানুষের চেহারা দেখবার জন্যে তাদের আর কৌতূহলের শেষ নেই!

চাঁদ-সওদাগর ভারতবর্ষ থেকে অনেক রকম মণ্ডা মিঠাই এনেছিলেন। রাক্ষসদের মধ্যে তাই বিলিয়ে দিলেন।

এমন অপূর্ব জিনিস তারা জীবনে আর কোন দিনও খায়নি। রাজা চন্দ্রকেতুও কিছু মিঠাই মুখে দিয়ে আহ্লাদে আটখানা হলেন। অন্য রাক্ষসদের তো আর কথাই নেই, তারা মিঠাই মুখে দিয়ে ধেই ধেই করে' নাচ জুড়ে দিল।

রাজা চন্দ্রকেতু চাঁদ-সওদাগরের ব্যবহারে এতই সন্তুষ্ট হলেন যে তিনি তাঁকে তাঁর রাজকোষের অর্ধেক ধনরত্ন উপহার দিয়ে বসলেন।

চাঁদ-সওদাগর রাক্ষস-রাজের রাজকোষ থেকে কত মণি-মুক্তা, হীরা-জহরৎ, সোনা-দানা ইত্যাদি পেয়ে গেলেন বিনা কষ্টে বিনা পরিশ্রমে। তারপর সেই সব অতুল ঐশ্বর্যে নিয়ে চন্দ্রধর চলে' এলেন নিজের ডিঙ্গায়।

আবার ভেসে চল্ল চাঁদ-সওদাগরের চৌদ্দ-ডিঙ্গা মধুকর লঙ্কাপুরীর দিকে।

বিভীষণের সভায়

এইভাবে কিছুদিন যায়—আর একদিন আলো ঝল্‌মল্‌ সকালবেলা চাঁদের ডিঙ্গা এসে লাগল লঙ্কার ঘাটে।

লঙ্কাপুরীতে মণি মুক্তার ছড়াছড়ি। হীরা-জহরতের জৌলুসে চোখ যেন ঠিক্‌রে পড়ে! প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অট্টালিকার চূড়া আকাশে গিয়ে ঠেকেছে।

রাজ্যের প্রহরীরা গিয়ে লঙ্কার রাজা বিভীষণকে খবর দিল, "মহারাজ, আমাদের লঙ্কাপুরীতে এক মানুষ সওদাগর এসে হাজির হয়েছে।"

লঙ্কাপুরীতে মানুষ এসেছে, এই সংবাদ পেয়ে রাক্ষসদের মধ্যে হুলুস্থূল পড়ে' গেল। তারা তো ভয়েই অস্থির। একবার এক মানুষ এসে তাদের সোনার লঙ্কা ছারখার করে' দিয়েছিল! সে কথা তারা এখনো ভুলে যায়নি। আবার কোন্‌ মানুষ এসে হাজির হোলো? তার উদ্দেশ্যই বা কি? ভেবে ভেবে রাক্ষসেরা দস্তুরমত অস্থির হয়ে উঠল।

রাজা বিভীষণ প্রহরীদের মুখে সমস্ত খবর শুনে স্থির করলেন পরদিন সকালে চাঁদ-সওদাগরের সঙ্গে দেখা করবেন।

প্রহরীরা ঘাটে গিয়ে এই আদেশ চাঁদকে জানাল। মনসাদেবী কিন্তু চুপ করে' বসে' নেই। তিনি সর্বদাই চেষ্টা করছেন—কি করে' চাঁদকে [illegible] তিনি যেন কিছুতেই তাঁর সঙ্গে পেরে উঠছেন না।

চাঁদ-সওদাগর নিরাপদে এসে লঙ্কায় পোঁচেছেন, এবার তাঁকে একটু জব্দ করা দরকার। তা রাত্রিবেলাই মনসাদেবী স্বপ্নে বিভীষণকে দেখা দিলেন।

স্বপ্নের মাঝে তিনি বিভীষণকে বল্লেন, "হে বৎস বিভীষণ, এই যে সওদাগর তোমার দেশে এসে হাজির, হয়েছে, এর উদ্দেশ্য বড় ভালো নয়। সঙ্গে করে' সে অনেক বিষাক্ত খাবার নিয়ে এসেছে। যে খাবে তারই দফা শেষ হয়ে যাবে। এই দুষ্টু সওদাগরকে ধরে' শিকলে বেঁধে কারাগারে দাও। তা না হলে, তোমার সোনার লঙ্কাপুরী আবার ধ্বংস হয়ে যাবে।" এই বলে' পদ্মাবতী অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

পরদিন সকালে উঠে বিভীষণ সেই স্বপ্নের কথা মন্ত্রীদের কাছে বল্লেন, তারপর সকলে মিলে পরামর্শ করে' স্থির করলেন, এই দুষ্টু সওদাগরকে বন্দী করে' রাখতে হবে।

রাজা বিভীষণের আদেশে প্রহরীরা চাঁদ-সওদাগরকে রাজ সভায় এনে হাজির করল।

সওদাগরের দেবতার মত রূপ দেখে বিভীষণ মুগ্ধ হয়ে গেলেন। তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন।

চাঁদ বল্লেন, "আমি চম্পক-নগরের একজন বণিক্। লঙ্কায় বাণিজ্য করতে এসেছি। আমার আর অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই।"

বিভীষণ রাক্ষস হলেও মনটা ছিল তাঁর ভালো। চাঁদের কথা শুনে তিনি রাত্রের স্বপ্নের কথা ভুলে গেলেন—আর চাঁদকে খুব খাতির করতে লাগলেন।

নিজের পরিচয় দেবার পর চাঁদ তাঁর সঙ্গে যত মণ্ডা মিঠাই ছিল, রাজাকে খেতে দিলেন। মিঠাই মণ্ডা দেখে বিভীষণের আবার রাত্রের

সেই স্বপ্নের কথা মনে পড়ে গেল, পদ্মাবতীর কথাগুলি এবার তাঁকে বিশেষ করে' ভাবিয়ে তুল্ল। ভাবলেন নিশ্চই এই দুষ্টু সওদাগর বিষাক্ত খাবার খাইয়ে তাঁকে মারবার মতবল করছেন।

এই মনে করে' তিনি ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে তৎক্ষণাৎ প্রহরীদের আদেশ দিলেন চাঁদকে বন্দী করে' কারাগারে নিয়ে যেতে।

রাজার আদেশ পেয়ে প্রহরীরা চাঁদকে শিকলে বেঁধে কারাগারে আটকে রাখল।

চন্দ্রধর মনে মনে বুঝলেন, এ নিশ্চয়ই পদ্মাবতীর চক্রান্ত। সে নিশ্চয় দুষ্টুবুদ্ধি দিয়ে রাজা বিভীষণের মাথা গোলমাল করে' দিয়েছে।

কারাগারে বসে' চাঁদ-সওদাগর চীৎকার করে' কাঁদতে আরম্ভ করলেন আর দুর্গাকে ডাকতে লাগলেন—"মাগো দুর্গা, আর এই যন্ত্রণা সহ্য করতে পারছি না মা! তোমার এই অধম-সন্তানকে রক্ষা কর মা! মনসার অত্যাচার থেকে আমাকে বাঁচাও মা! তোমাদের আশীর্বাদ নিয়েই আমি লঙ্কায় যাত্রা করে' এসেছি। এ বিপদ্ থেকে উদ্ধার কর মা!"

ভক্তের কাতর ডাকে মা-দুর্গা আর স্থির থাকতে পারলেন না, এসে দেখা দিলেন, আর চাঁদকে অভয় দিয়ে বল্লেন, "বৎস, চিন্তা কোরো না, কাল প্রভাতেই তুমি মুক্তিলাভ করবে।"

———
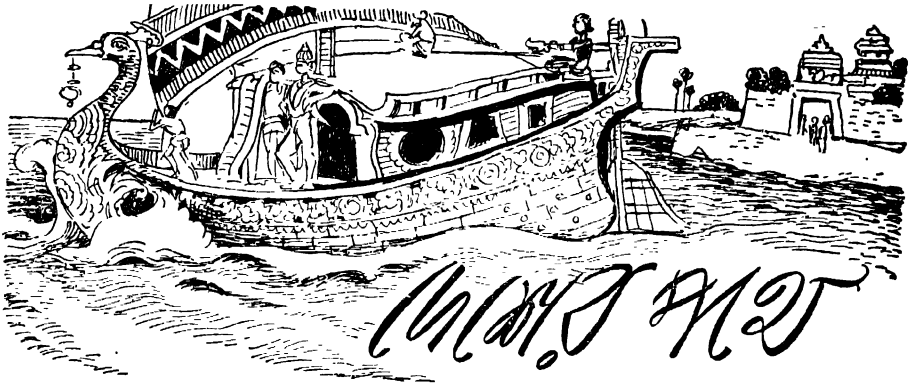
রাত্রে রাজা বিভীষণ স্বপ্নে দেখলেন দেবী দুর্গা এসে তাঁকে বলছেন ঃ "ওহে বিভীষণ, তোমার দেশে নিরীহ চাঁদ-সওদাগর বাণিজ্য করতে এসেছে, তুমি বিনা দোষে তাকে কারাগারে বন্দী করেছ। পদ্মাবতী তোমাকে স্বপ্নে প্রবঞ্চনা করেছেন। চাঁদের কোনো অপরাধ নেই। কাল সকালেই তাকে মুক্তি দাও, তার সঙ্গে বন্ধুত্ব কর, আর চাঁদের সঙ্গে তোমার ধনদৌলত অদল-বদল কর। আমার কথা যদি অমান্য কর, তবে তোমার সর্বনাশ হবে!" এই বলে' দেবী অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

সকালবেলা ঘুম ভাঙলে বিভীষণ বিশেষ চিন্তিত হয়ে আবার পাত্র-মিত্রদের ডেকে রাত্রের স্বপ্নের কথা বল্লেন।

বিভীষণ বুঝতে পারলেন চাঁদ-সওদাগর সামান্য মানুষ নন, তিনি দেবী দুর্গার বরপুত্র।

তিনি পারিষদদের বল্লেন, "চাঁদ-সওদাগর সামান্য মানুষ নয়, স্বয়ং দুর্গাদেবীর বরপুত্র। বুঝতে পারছি মনসার সঙ্গে তার শত্রুতা আছে। কারাগারে চাঁদ বিনা কারণে কষ্ট পাচ্ছে। তার শিকল খুলে তাকে শীগ্‌গির যথাযোগ্য সম্মান দেখিয়ে আমার কাছে নিয়ে এসো।"

চাঁদ-সওদাগরের সঙ্গে মনসার বিবাদ আছে আর সেই জন্যেই মনসাদেবী স্বপ্নের মাঝে চাঁদ সওদাগরকে কারাগারে দিতে বলেছেন, একথা বিভীষণ এবার বেশ ভালো করেই বুঝতে পারলেন। তিনি এই বিদেশী বণিকের উপর যে খারাপ ব্যবহার করেছেন, তার জন্যে বিশেষ অনুতপ্ত হলেন। মা-দুর্গা এজন্য তাঁর উপর যে ক্রুদ্ধ হয়েছেন তাও তিনি বেশ উপলব্ধি করলেন।

তৎক্ষণাৎ তিনি প্রহরীদের ডেকে চাঁদকে কারাগার থেকে নিজের সভায় হাজির করতে আদেশ দিলেন।

চন্দ্রধর রাজার সভায় এলে বিভীষণ অত্যন্ত লজ্জিত হলেন, আর তাঁকে হাত ধরে' নিজের সিংহাসনে বসিয়ে বল্লেন, "ভাই, আমার অপরাধ ক্ষমা কর! আমি না বুঝে তোমাকে কঠিন সাজা দিয়েছি।"

চাঁদ-সওদাগর আগেই বুঝতে পেরেছিলেন, বিভীষণ মনসার চক্রান্তেই তাঁকে কারাগারে দিয়েছিলেন, তাঁর নিজের কোন দোষ নেই। তাই তিনি বল্লেন, "হে লঙ্কার রাজা বিভীষণ, আপনার বিশেষ দোষ এতে নেই। এর মূলে আছে আমার চিরশত্রু পদ্মাবতী। তারই ছলনায় পড়ে' আপনার বুদ্ধিনাশ হয়েছিল। আমি দেশে ফিরে গিয়ে তার সমুচিত প্রতিফল্ দেব।"

বিভীষণ বল্লেন, "হ্যাঁ, পদ্মাবতী আমাকে স্বপ্নের মধ্যে কু-মত্‌লব দিয়ে এই অন্যায় কাজ করিয়েছিল।'

এই বলে রাজা বিভীষণ চাঁদ-সওদাগরকে আলিঙ্গন করলেন আর তাঁর অভ্যর্থনার যথোচিত ব্যবস্থা করলেন।

দুর্গাদেবী স্বপ্নে বিভিষণকে আদেশ দিয়েছিলেন, চাঁদ-সওদাগরের সঙ্গে তাঁর ধনসম্পত্তি বদল করতে।

● দেশের পথে ●

সেই আদেশ অনুযায়ী লঙ্কার রাজা চন্দ্রধরের সঙ্গে তাঁর সম্পত্তির অদল- বদল করলেন।

চাঁদের সঙ্গে ঐশ্বর্য বড় কম ছিল না, তার বদলে তিনি বিভীষণের কাছ থেকে যে ঐশ্বর্য লাভ করলেন। তাঁর সঙ্গে যে সব ফলমুল, মণ্ডা মিঠাই প্রভৃতি ছিল সেগুলির বদলেও চাঁদ প্রচুর অর্থ লাভ করলেন।

এইবার বিদায়ের পালা। দেশে ফিরবার আগে চাঁদ-সওদাগরের ইচ্ছা হোলো লঙ্কাপুরীটা একবার ভালো করে' দেখে যাবেন।

বিভীষণ তার ব্যবস্থা করে' দিলেন।

রাবণের পুরী, ইন্দ্রজিতের বাড়ী, কুম্ভকর্ণের ঘর, অশোক-কানন প্রভৃতি বেশ ভালো করে' দেখে চাঁদ-সওদাগর রাজা বিভীষণের কাছে বিদায় নিয়ে মধুকর-ডিঙ্গায় গিয়ে উঠলেন।

আবার অকূল সমুদ্রে ভেসে চল্ল চাঁদের চৌদ্দটি ডিঙ্গা অনুকূল বাতাসে শোঁ শোঁ করে'।

মনের সাধ পূর্ণ হওয়ায় চাঁদের আর আনন্দের শেষ নেই, তাঁর সঙ্গী-সাথীরাও আহ্লাদে আত্মহারা।

বিশেষ করে' পদ্মাবতীকে যে তাঁর কাছে হার মানতে হচ্ছে, এ ভেবেও চাঁদ-সওদাগর খুব খুশী হলেন।

———

চাঁদ-সওদাগর তাঁর চৌদ্দ ডিঙ্গা বেয়ে বেশ মনের আনন্দে দেশে ফিরে আসছেন। কতদিন পর দেশে ফিরছেন, মন তার খুশীতে ভরে উঠেছে। তাঁর দলেরও সকলের মুখে হাসি আর ধরে না!

লঙ্কার অতুল ঐশ্বর্য নিয়ে ফিরছেন চন্দ্রধর, তাঁর কত দিনের স্বপ্ন এবার সফল হয়েছে।

বেশ ভালোয় ভালোয় কিছুদিন কাটল। এবার তাঁরা এসে পড়লেন কালী দহের জলে।

আকাশ এতদিন ছিল বেশ পরিষ্কার, সমুদ্রের জল ছিল শান্ত, বাতাস ছিল অনুকূল। কিন্তু হঠাৎ এ কি!

আকাশের ঘোর পরিবর্তন দেখা দিল,—কালো কালো মেঘে সারা আকাশ ছেয়ে গেল, বাতাস হয়ে উঠল অস্থির, কালীদহের জল হয়ে উঠল চঞ্চল।

দেখতে দেখতে এলো প্রলয়ের ঝড়। ওঃ সে কী ঝড়, সে কী তুফান! সারা পৃথিবী যেন অন্ধকার হয়ে গেল, আর কালীদহের কালো জলে উঠল পাহাড়ের মত ঢেউ।

আর বুঝি রক্ষা নাই। চাঁদ-সওদাগরের পাকা মাঝির দল কিছুতেই
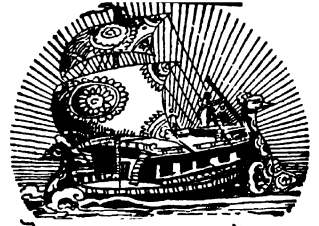
আর ডিঙ্গা সামলাতে পারছে না। চৌদ্দটি ডিঙ্গা সেই দূরন্ত তরঙ্গের মধ্যে মোচার খোলার মত টল্‌মল্ করতে লাগল।

আর উপায় না দেখে, চাঁদ-সওদাগর প্রাণের ভয়ে শ্রীদুর্গাকে স্মরণ করতে লাগলেন—"রক্ষা কর মা, রক্ষা কর মা!"

দলের সবাই আতঙ্কে চীৎকার আরম্ভ করল। এবার মৃত্যু নিশ্চিত!

ক্রমেই ঝড় বেড়ে উঠছে। নৌকায় ঝলকে ঝলকে জল উঠছে। কালীদহের জল কালীর বর্ণ ধারণ করেছে, আর কী ভীষণ তার স্রোত! এক এক জায়গায় জল প্রচণ্ডভাবে ঘূর্ণিপাক খেতে খেতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গর্তের সৃষ্টি করছে।

সেই পাকের মধ্যে পড়লে, চাঁদের ডিঙ্গা কোন্ অতলে তলিয়ে যাবে তার ঠিক-ঠিকানা নেই!

ঠিক এমনি সময়ে দেখা দিলেন মনসাদেবী। তিনি শূন্য থেকে চাঁদ-সওদাগরকে ডেকে বল্লেন, "ওহে সওদাগর, যদি জীবনের প্রতি বিন্দুমাত্র মায়া থাকে, তবে আমার পায়ে গন্ধপুষ্প দিয়ে পূজা কর! আমি তোমার সব অপরাধ ক্ষমা করব, এমন কি তোমার ছয় ছেলেকে আবার বাঁচিয়ে দেব।"

চাঁদ-সওদাগর এবার বুঝতে পারলেন এ মনসার কীর্তি। না হলে এই অসময়ে এরকম তুফান আসবে কেমন করে'?

পদ্মাবতীর কথা শুনে চাঁদ-সওদাগর যেন তেলে বেগুনে জ্বলে' উঠলেন। তিনি অত্যন্ত কটুভাষায় মনসাকে গালাগালি দিয়ে বল্লেন, "আমি মরি সেও ভালো, কিন্তু তোমায় পূজো করব না কোনো দিন।"

চাঁদের ব্যবহারে মনসাদেবী আরো ক্রুদ্ধ হয়ে পবনদেবকে বল্লেন, "ওহে পবন, তুমি চাঁদ-সওদাগরের ডিঙ্গাখানি সমুদ্রে ডুবিয়ে দাও।"

মনসার আদেশে পবন তখনি এক ঝট্‌কায় চাঁদ-সওদাগরের মধুকর- ডিঙ্গাখানি সমুদ্রে ডুবিয়ে দিলেন। লোকজন সমেত চাঁদ সমুদ্রের অথৈ জলে পড়ে' গেলেন।

চাঁদ-সওদাগরের অবস্থা হোলো অতিশয় শোচনীয়। ঐ অশান্ত সমুদ্রের মধ্যে তিনি হাবুডুবু খেতে লাগলেন। কখনো তলিয়ে যান, কখনো আবার ভেসে ওঠেন। লোকজন যে কোথায় ভেসে গেল, তার কোনো ঠিকানা রইল না।

এই রকম সাত দিন, সাত রাত ভাসতে ভাসতে চাঁদ-সওদাগর একদিন মৃতপ্রায় হয়ে সমুদ্রের কূলে এসে পোঁছালেন।

এতদিন খাওয়া-দাওয়া হয়নি, তার উপর প্রবল স্রোতের সঙ্গে তাঁকে রীতিমত লড়াই করতে হয়েছে। শরীর তাঁর অবসন্ন, মন তাঁর যেন ভেঙ্গে পড়েছে।

কোনো রকমে তীরে উঠে তিনি একটা গাছতলায় এসে বসলেন। এমন সময় এক ব্রাহ্মণ এসে চাঁদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন।

———

ভগবতীর কৃপা

চাঁদ সওদাগরের মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে ব্রাহ্মণ তাঁকে নিজের বাড়ীতে নিয়ে গেলেন।

সেখানে কিছুকাল বাস করার পর চন্দ্রধর জানতে পারলেন, কিছু দূরে কন্দর্পনগরে তাঁর এক বন্ধু বাস করেন, তাঁর নাম চন্দ্রকান্ত।

লোকের মুখে তাঁর কথা শুনে চাঁদ-সওদাগর বন্ধুর সঙ্গে গিয়ে দেখা করলেন।

বহুকাল পরে বন্ধুকে দেখে চন্দ্রকান্ত তো আনন্দে অধীর হয়ে উঠলেন। তিনি চাঁদকে প্রশ্ন করলেন, "বন্ধু, তোমার এ দুর্দশা হোলো কি করে'? তোমার এরকম পাগলের বেশে দেশদেশান্তরে ঘুরে বেড়াবার কারণ কি?"

বন্ধুর এই প্রশ্ন শুনে চাঁদ তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে' হাউ-হাউ করে' কেঁদে উঠলেন, তারপর তাঁকে সমস্ত কাহিনী ভেঙে বল্লেন। তাঁর সঙ্গে মনসার ঝগড়ার কথা, তাঁর বাণিজ্যে যাবার কথা, সমুদ্রে ঝড়ের কথা,—কিছুই বলতে বাকী রাখলেন না! মনসার চক্রান্তে পড়ে' তাঁর এতদিন কত কষ্টই না সহ্য করতে হয়েছে, কোনো রকমে প্রাণ নিয়ে তিনি এখানে এসে পৌঁচেছেন।

বন্ধুর দুঃখের কাহিনী শুনে চন্দ্রকান্ত তাঁকে অভয় দিয়ে শান্ত করলেন, আর ভরসা দিলেন শীগ্‌গির তাঁকে দেশে পাঠাবার ব্যবস্থা করে' দেবেন।

বন্ধুর বাড়ীতে চাঁদ বেশ সুখেই আছেন। কিন্তু মনসাদেবী যাঁর বিরুদ্ধে তাঁর কি আর সুখশান্তি আছে!

পদ্মাবতী একদিন রাত্রে চন্দ্রকান্তকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বল্লেন, "ওহে সাধু চন্দ্রকান্ত, যদি ভালো চাও তো চাঁদ-সওদাগরকে বাড়ী থেকে দূর করে' দাও। তুমি যদি আমার কথা না শোনো, তবে আমি তোমারও বিরুদ্ধে লাগব। আমার নাগ-সৈন্য দিয়ে তোমার সর্বনাশ করব।"

এই স্বপ্ন দেখে চন্দ্রকান্ত তো ভয়েই অস্থির। মা-মনসা একবার ক্রুদ্ধ হলে আর রক্ষা নাই। ধনে-জনে সব নষ্ট হয়ে যাবে।

ভোরবেলা উঠে চন্দ্রকান্ত বন্ধু চাঁদ-সওদাগরকে স্বপ্নের কথা বল্লেন। সমস্ত কথা শুনে চাঁদ বল্লেন, "বন্ধু, তুমি চিন্তা কোরো না, আমি আজই বিদায় নিয়ে যাচ্ছি। তা হলে তোমার আর কোনো ভয় নাই।"

এই বলে' শ্রীদুর্গার নাম স্মরণ করে চাঁদ-সওদাগর বন্ধুর কাছে বিদায় নিয়ে পথে বেরিয়ে পড়লেন।

পথঘাট তাঁর সম্পূর্ণ অজানা, অচেনা। সেই সব অপরিচিত যায়গা দিয়ে তিনি চলতে লাগলেন চম্পক-নগরের খোঁজে। মনসাদেবীর ভয়ে কেউ তাঁকে সাহায্য করতে ভরসা পেল না।

এই রকম ভাবে ঘুরতে ঘুরতে ছয় মাস কেটে গেল।

শেষে একদিন তিনি এসে প্রবেশ করলেন এক গভীর বনের মধ্যে। বনের মধ্যে ঢুকে তিনি আর পথ খুঁজে পান না। বড়ই বিপদে পড়লেন তিনি।

● ভগবতীর কৃপা ●

আর কোনো উপায় স্থির করতে না পেরে চণ্ডীর ভক্ত চাঁদ-সওদাগর মা-দুর্গার ধ্যান করতে আরম্ভ করলেন। অগতির গতি তিনি ভক্তের অধীন তিনি—তাঁকে ডাকলে অবশ্যই তিনি ভক্তকে এই বিপদ্ থেকে রক্ষা করবেন।

চন্দ্রধরের আকুল প্রার্থনায় মহামায়ার আসন টল্‌ল। তিনি যোগিনীর বেশ ধারণ করে' এসে চাঁদকে দেখা দিলেন।

গভীর অরণ্যের মধ্যে যোগিনীর জ্যোতির্ময়ী মূর্তি দেখে চাঁদ অবাক্ হয়ে গেলেন, তিনি তৎক্ষনাৎ একান্ত ভক্তির সঙ্গে তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়লেন।

তিনি বুঝতে পারলেন না যে সাক্ষাৎ ভগবতী এই যোগিনীর বেশে তাঁকে দেখা দিতে এসেছেন।

চাঁদের মুখে সমস্ত দুঃখের কাহিনী শুনে যোগিনী হাসিমুখে তাঁকে অভয় দিলেন আর চম্পক-নগরে যাবার সোজা পথ দেখিয়ে দিলেন।

এদিকে কিন্তু মনসাদেবী চুপ করে' বসে' নেই। তিনি অন্তরাল থেকে সবই লক্ষ্য করছেন।

যোগিনী যখন চাঁদ-সওদাগরকে চম্পক-নগরের পথ দেখিয়ে দিলেন, ঠিক সেই সময় পদ্মাদেবী এসে উপস্থিত হলেন চন্দ্রধরের স্ত্রী সুনুকার কাছে এক ব্রাহ্মণীর বেশ ধরে' !

পদ্মা এসে সুনুকাকে বল্লেন, "মা, আজ তোমার বড়ই অশুভ দিন। তোমার ছেলে লক্ষ্মীন্দরের আজ মস্ত একটা ফাঁড়া আছে। আজ সন্ধ্যাবেলা তোমার বাড়ীতে উপস্থিত হবে এক ভূত। খবরদার, তাকে বাড়ীতে ঢুকতে দিও না। চারিধারে কড়া পাহারা দেবার ব্যবস্থা কর।"

এই বলে' পদ্মাবতী বিদায় নিলেন। সুনুকা মনসার চাতুরী কিছুই ধরতে পারলেন না, সরলভাবেই ব্রাহ্মণীর কথা বিশ্বাস করলেন। সেই দিনই সন্ধ্যাবেলা যে তাঁর স্বামী চন্দ্রধর দেশে ফিরে আসছেন এ কথা তাঁর স্বপ্নেরও অতীত।

রাজপুরীতে সন্ধ্যাবেলা ভূত প্রবেশ করবে ভেবে তিনি পুরীর চারিধারে কড়া পাহারার ব্যবস্থা করলেন।
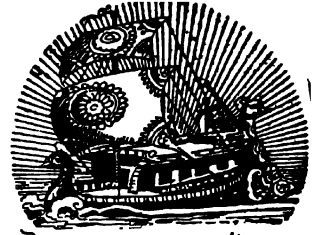
এদিকে চাঁদ-সওদাগর নদী-নালা পার হয়ে, পাহাড়- পর্বত ডিঙ্গিয়ে ঠিক সন্ধ্যার সময় উপস্থিত হলেন চম্পক- নগরে।

তাঁর শরীর ও মন একেবারে ভেঙে পড়েছে। অমন সুন্দর চেহারা একেবারে মলিন হয়ে গেছে। দেখলে আর চেনবার জো নেই।

বাস্তবিক এতদিনের পথশ্রমে, অনাহারে আর দুঃখে-কষ্টে পড়ে' তাঁর অবস্থা হয়েছে অতি শোচনীয়।

রাতের অন্ধকারে তাঁকে দেখলে আর সহজে মানুষ বলে' চেনা দুষ্কর।

চাঁদ-সওদাগর এতদিন পর রাজপুরীতে এসেছেন,—মন তাঁর আবার আনন্দে ভরে' উঠল। উৎসাহের সঙ্গে বাড়ীতে ঢুকতে গেলেন।

কিন্তু এ কি! প্রহরীরা 'মার্ মার' করে' তেড়ে এলো তাঁর দিকে। তিনি তাঁর পরিচয় দিতে গেলেন, কিন্তু কে শোনে তাঁর কথা! সকলে মিলে তাঁকে ঘিরে বেদম প্রহার দিতে লাগল। কেউ মারে ঘুঁসি, কেউ মারে চড়, কেউ মারে লাথি।

ব্যথার চোটে চাঁদ "সুনুকা, সুনুকা" বলে' চীৎকার করে' কাঁদতে সুরু করলেন।

সওদাগরের আকুল কান্নার স্বর সুনুকার কানে গেল। তিনি স্বামীর স্বর চিনতে পেরে তাড়াতাড়ি প্রদীপ নিয়ে সেখানে হাজির হলেন।

স্বামীকে চিনতে তাঁর একমুহূর্ত দেরী হোলো না। তাঁর অবস্থা দেখে তিনি 'হায় হায় করে' উঠলেন।

স্বামীর যে এই দুর্দশা হবে, তা সুনুকার কল্পনার অতীত। কোথায় গেল তাঁর চৌদ্দ ডিঙ্গা, কোথায় তাঁর অনুচরের দল?

সুনুকা অস্থির হয়ে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে’ স্বামীকে ব্যাকুল করে’ তুল্লেন।

সংক্ষেপে সমস্ত কথাই চাঁদ-সওদাগর তাঁকে বল্লেন।

চাঁদের মুখে সমস্ত কথা শুনে সুনুকার চোখ দিয়ে দর্‌দর্‌ করে’ জল ঝরতে লাগল। হায় হায়, স্বামী তাঁর কত দুঃখ পেয়েছেন!

তিনি তাড়াতাড়ি নাপিত ডাকিয়ে তাঁর চুল ছাঁটিয়ে দিলেন, দাড়ি কামিয়ে দিলেন। তারপর তেল মাখিয়ে স্নান করালেন।

স্নান সেরে চাঁদ-সওদাগর ভালো পোষাক-পরিচ্ছদ পরে’ খেতে বসলেন। সুনুকা নিজের হাতে স্বামীর জন্যে নানা রকম খাবার তৈরি করে’ দিলেন।

বহুদিন পর নানা রকম সুস্বাদু খাবার পেয়ে চাঁদ-সওদাগর পরিতৃপ্তির সঙ্গে আহার করলেন। তাঁর শরীরের সমস্ত গ্লানি যেন এক নিমেষে দূর হয়ে গেল।

এবার হোলো তাঁর লক্ষ্মীন্দরের সঙ্গে পরিচয়। ছেলের অপূর্ব সৌন্দর্য দেখে চাঁদ তো মুগ্ধ হয়ে গেলেন। এমন সোনার-চাঁদ ছেলে পেলে কার না আনন্দ হয়! চাঁদ আবেগের সঙ্গে ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

লক্ষ্মীন্দরের বিয়ের আয়োজন

লক্ষ্মীন্দর এতদিনে বেশ বড়-সড় হয়ে উঠেছেন। বিদ্যায় বুদ্ধিতে সারা চম্পক-নগরে তাঁর সমান আর কেউ ছিল না। যেমনি তাঁর রূপ, তেমনি গুণ। তাঁর খ্যাতি দেশবিদেশে রটে' গেল।

চাঁদ-সওদাগর ছেলের বিয়ের জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। কত সম্বন্ধ আসে কিন্তু চন্দ্রধরের পছন্দ হয় না। কেউই তাঁর মনের মত হয় না।

শেষে শুনতে পেলেন উজানীর রাজা মুক্তেশ্বরের একটি পরমাসুন্দরী মেয়ে আছে। নাম তাঁর বেহুলা। মেয়েটির গুণের শেষ নাই।

শুধু তাই নয়, তাঁর একটি অদ্ভুত ক্ষমতা আছে, লোহার চা'ল থেকে তিনি ভাত রান্না করতে পারেন।

এই সুলক্ষণা মেয়েটিই তাঁর উপযুক্ত পুত্রবধূ হবে ভেবে তিনি ছেলেকে নিয়ে একদিন উজানীতে এসে উপস্থিত হলেন।

রাজা মুক্তেশ্বর সে সময় সভায় ছিলেন, চাঁদ সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে' মুক্তেশ্বরের সভায় উপস্থিত হলেন।

মুক্তেশ্বর-রাজার সভাতে চাঁদ-সওদাগর উপস্থিত হতেই, তাঁর পরিচয় পেয়ে রাজা খুব আনন্দিত হলেন। তারপর যখন শুনলেন তাঁর মেয়ের সঙ্গে

চাঁদ-সওদাগর তাঁর ছেলের বিয়ে দিতে চান, তখন রাজা মুক্তেশ্বর বেশ খুশী হয়েই তাতে সম্মতি দিলেন।

চাঁদ-সওদাগরের খ্যাতি তখন চারিধারে ছড়িয়ে পড়েছিল, রাজা মুক্তেশ্বরও তাঁর কথা বেশ ভালোভাবেই জানতেন। কাজেই চাঁদের বাড়ীতে মেয়ের বিয়ে দিতে তাঁর কোনো আপত্তির কারণই রইল না।

চাঁদের সঙ্গে তাঁর ছেলে লক্ষ্মীন্দরও উপস্থিত ছিলেন। ভাবী জামাতার রূপ দেখে মুক্তেশ্বর একেবারে অবাক্ হয়ে গেলেন। মানুষের ঘরে এমন রূপবান্ ছেলে হতে পারে, তা আগে তাঁর ধারণা ছিল না।

বিয়ের সমস্ত কথা পাকাপাকি করে' চাঁদ আবার চম্পক-নগরে ফিরে এলেন।

স্নুকা স্বামীর মুখে সকল কথা শুনে বল্লেন, "একটি কথা তোমায় বলা হয়নি। লক্ষ্মীন্দরের জন্মের পর জ্যোতিষীরা তার ঠিকুজি বিচার করে' দেখেছেন,—বিয়ের পর বাসরঘরে লক্ষ্মীন্দরের সাপের ভয় আছে।"

স্নুকার এই কথা শুনে চাঁদ বেশ একটু চিন্তিত হলেন। শেষে সকলের পরামর্শ করে' স্থির করলেন, ছেলের জন্যে একটি লোহার বাসরঘর তৈরি করবেন।

তাঁর রাজ্যে ছিল কামারের সেরা কামার বিনোদ কর্মকার। সওদাগর তাকে ডেকে পাঠালেন।

বিনোদ কমকার উপস্থিত হয়ে চাঁদ-সওদাগরের কাছে হাত জোড় করে' দাঁড়াল।

চাঁদ-সওদাগর তাকে বল্লেন, "এমন একটি লোহার বাসরঘর তৈরি করে' দাও, যাতে একটি পিঁপড়ে পর্যন্ত প্রবেশ করতে না পারে। তুমি

আমার রাজ্যের সেরা কর্মকার, আমার মনে হয় তোমার দ্বারাই এ কাজ হতে পারে। খুব সাবধানে কাজ আরম্ভ কর।"
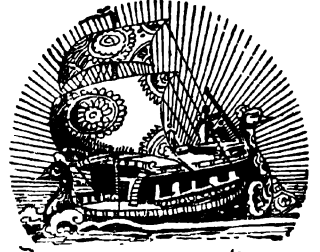
চাঁদের আদেশ পেয়ে বিনোদ কর্মকার শত শত ওস্তাদ কামার এনে অতি অল্পদিনের মধ্যেই চমৎকার একটি লোহার ঘর তৈরি করে' ফেল্ল।

ঘরটি এমন অদ্ভুতভাবে তৈরি করা হোলো যে, সামান্য বাতাস প্রবেশ করবার মত ছিদ্রও রইল না।

চাঁদ-সওদাগর সেই ঘর দেখে তো মহা খুশী। সাপ তো দূরের কথা, একটা সামান্য পিঁপড়ে পর্যন্ত সে ঘরে ঢুকতে পারবে না।

চাঁদ তাঁর মনের মত কাজ দেখে ভারি আনন্দিত হয়ে কামারদের নানা রকম পুরস্কার দিলেন! কামারের দল সন্তুষ্ট হয়ে বাড়ীর দিকে রওনা হোলো।

চাঁদ-সওদাগর তখন সুনুকাকে ডেকে বল্লেন, "আর ভয় নেই সুনুকা, মনসাদেবী মত্লব করেছিল, বাসরঘরে লক্ষ্মীন্দরকে সাপের কামড় খাওয়াবে। তা আর হচ্ছে না,—এই দেখ, লোহার বাসরঘরে একটা পিঁপড়ে কি মশাও ঢুকতে পারবে না, সাপ তো দূরের কথা। এইবার নিশ্চিন্ত হয়ে লক্ষ্মীন্দরের বিয়ে দেওয়া যাক্।"

স্বামীর কথা শুনে আর লোহার ঘর দেখে সুনুকাও আশ্বস্ত হলেন।

———

লক্ষ্মীন্দরের বিয়ে

লোহার বাসরঘর তৈরি করে' বিনোদ কর্মকার তার দলবল নিয়ে বাড়ী ফিরে চলেছে, এমন সময় হঠাৎ পথের মধ্যে পদ্মাবতী এসে তাকে দেখা দিলেন। চোখ তাঁর রক্তবর্ণ, দেখে মনে হোলো তিনি ভীষণ চটে' গেছেন।

ক্রোধে কাঁপতে কাঁপতে মনসাদেবী বিনোদকে বল্লেন, "ওরে পাপিষ্ঠ কামার, তোর বড় আস্পর্ধা দেখছি! তুই আমার সঙ্গে শত্রুতা আরম্ভ করেছিস্! চাঁদ-সওদাগরের আদেশে তুই লোহার বাসরঘর তৈরি করেছিস্। তুই কি জানিস্ না, চাঁদ আমার চিরশত্রু? যদি ভালো চাস্, তবে শীগ্‌গির ঐ লোহার বাসরঘরে গোপনে একটি ছিদ্র করে' দিয়ে আয়। আমার কথা যদি না শুনিস্, তবে আমার নাগ-সৈন্য দিয়ে তোকে নির্বংশ করে' ছাড়ব্।"

মনসাদেবীর কথায় বিনোদ কর্মকার তো কেঁপেই অস্থির। ভয়ে তার প্রাণ গেছে উড়ে। সে তৎক্ষণাৎ তাঁর কথায় রাজি হয়ে গেল। সন্তুষ্ট হয়ে পদ্মাবতী তাঁর নাগ-সৈন্য নিয়ে প্রস্থান করলেন।

এদিকে বিনোদ কর্মকারের তো খাওয়া-দাওয়া গেল চুকে। রাত্রে বার বার স্বপ্ন দেখে সে চমকে উঠতে লাগল।

ভোরবেলা কামার তাড়াতাড়ি উঠে হাজির হোলো সেই লোহার বাসরঘরে,

তারপর অতি সাবধানে ধারালো অস্ত্র দিয়ে একটা ছিদ্র করে’ ফেল্ল।

শব্দ শুনে চাঁদ-সওদাগর ছুটে এলেন, তাঁর কেমন যেন একটা সন্দেহ হোলো।

বিনোদকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করতেই, সে বল্লে, “ঘরের এক কোণে কিছু কাজ বাকী ছিল, হঠাৎ সেই কথা মনে পড়ে’ যাওয়ায় তাড়াতাড়ি ছুটে এসে শেষ করে’ দিয়ে গেলাম।”

বিনোদের কথা শুনে চাঁদের আর সন্দেহ করবার কিছুই রইল না। খুশী হয়ে তাকে এক জোড়া পট্টবস্ত্র উপহার দিলেন।

লোহার বাসরঘর তৈরি হয়ে গেছে। নিখুত হয়েছে ঘরখানি। কোনো দিকে বাতাস যাওয়ার মত একটু ফুটোও নেই।

পরম নিশ্চিন্তে চাঁদ-সওদাগর লক্ষ্মীন্দরের বিয়ের আয়োজন শেষ করলেন। এইবার মনসাদেবী যে আচ্ছা জব্দ হবেন সে বিষয়ে চাঁদের আর কিছু মাত্র সন্দেহ রইল না।

শুভদিন শুভক্ষণ দেখে চাঁদ দলবল নিয়ে মহাসমারোহে হাজির হলেন এসে উজানীতে।

রাজা মুক্তেশ্বর সমাদরে সবাইকে অভ্যর্থনা করলেন, বরযাত্রীদের থাকবার সুব্যবস্থা করে’ দিলেন।

নানারকম বাজনা-বাদ্যি সুরু হোলো। দেশ জুড়ে আনন্দের ধুম পড়ে’ গেল।

ক্রমে বিয়ের শুভলগ্ন উপস্থিত হোলো। রাজা মুক্তেশ্বর পরমানন্দে নিজের কন্যা বেহুলাকে লক্ষ্মীন্দরের হাতে সমর্পণ করলেন।

ব্যস, তারপর আর কি! ভালোমত বিয়ের পর্ব চুকে গেল। স্থির হোলো, পরদিন ছেলে-বৌ নিয়ে চাঁদ-সওদাগর দেশে ফিরে যাবেন।

কিন্তু সেই রাত্রে ঘটল এক অদ্ভুত কাণ্ড। রাত্রে লক্ষ্মীন্দর আর বেহুলা ঘুমিয়ে আছেন। হঠাৎ একটা ভীষণ শব্দে বেহুলার ঘুম গেল ভেঙে। তিনি তাকিয়ে দেখলেন মস্ত এক সাপ তাঁদের ঘরে ঢুকে সোজা চলে’ আসছে তাঁদের বিছানার দিকে।

এই ব্যাপার দেখে বেহুলা তাড়াতাড়ি এক বাটি দুধ এনে সাপকে খেতে দিলেন।

সাপ যখন দুধ খাচ্ছে, সেই অবস্থায় বেহুলা তাকে বন্দী করে’ ফেল্লেন।

লক্ষ্মীন্দরের ঘুম ভাঙলে বেহুলা তাঁকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানিয়ে বল্লেন, “এখানে আর বেশীদিন থাকলে বিপদ্ ঘটতে পারে! শুনেছি চম্পক-নগরে লোহার বাসরঘর তৈরি হয়েছে। তাড়াতাড়ি এখন আমাদের সেখানেই যাওয়া উচিত। এখানে আর থাকা আমাদের উচিত নয়। মনসাদেবীর নাগ-সৈন্যেরা চারিধারে ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে। শ্বশুর মশাইয়ের সঙ্গে যে মনসাদেবীর শত্রুতা আছে তা আমি জানি। কাজেই সেই লোহার ঘরে থাকাই আমাদের ভালো।”

———

লক্ষ্মান্দরের মৃত্যু

পরদিন মহাসমারোহে ছেলে-বৌ নিয়ে চাঁদ-সওদাগর চম্পক-নগরে ফিরে এলেন।

বৌ দেখে তো সুনুকার মনে আনন্দ আর ধরে না। যেমনি ছেলে তাঁর তেমনি বৌ। সমস্ত শরীর দিয়ে যেন রূপ উছলে পড়ছে! রাজ্যের মেয়েরা দলে দলে এসে লক্ষ্মীন্দরের বৌকে দেখতে লাগল। যে দেখে সে-ই মুগ্ধ হয়ে যায়। যেন আকাশের কোন দেবী নেমে এসেছেন লক্ষ্মান্দরের বৌ হয়ে।

ক্রমে রাত্রি হয়ে এলো।

খাওয়া-দাওয়ার পর লক্ষ্মীন্দর আর বেহুলাকে সেই লোহার বাসরঘরে শুতে দেওয়া হোলো।

আজ রাত্রে লক্ষ্মীন্দরের একটা মস্ত ফাঁড়া আছে। বেহুলা সে কথা জানতেন।

সুনুকা বেহুলাকে সাবধান করে দিয়ে বল্লেন, “মা, আজ রাত্রে খুব সাবধানে থেকো। লক্ষ্মীন্দরের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রেখো। আজ তার মস্ত একটি ফাঁড়া আছে।”

শাশুড়ীর কথা শুনে সতী বেহুলা বল্লেন, “মাগো, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো।

আমি সমস্তই জানি। উজানী-নগরে মস্ত এক নাগকে আমি বন্দী করেছি। সেও নিশ্চয় মনসা-দেবীর আজ্ঞায় আমার স্বামীকে কামড়াতে এসেছিল। আজ সারারাত্রি জেগে আমি স্বামীকে পাহারা দেব। আপনার কোনো ভয় নাই।"

বেহুলার কথায় অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়ে সনুকা বিদায় নিলেন।

চাঁদ-সওদাগর রাত্রে লোহার বাসরের চারিদিকে কড়া পাহারার ব্যবস্থা করলেন।

শুধু তাই নয়। ময়ূর হচ্ছে সাপের ভীষণ শত্রু। চাঁদ-সওদাগর সেই লোহার ঘরের চারিদিকে ময়ূরের পাল ছেড়ে দিলেন, আর বাদ্যকরদের আদেশ দিলেন, সারারাত তারা যেন বাজনা বাজিয়ে ময়ূরের দলকে সজাগ রাখে, তারা যেন ঘুমাতে না পারে!

আর কিসের ভয়! একে ছিদ্রহীন লোহার ঘর, তারপর বাইরে এই রকম সুব্যবস্থা।

চাঁদ-সওদাগর ঘরে এসে মনের সাধে মনসাদেবীকে গালাগালি দিতে লাগলেন। এদিকে যে মহা-দুর্যোগ ঘনিয়ে আসছে সে কথা তিনি মোটেই ধারণা করতে পারলেন না।

নাগের সেরা ছিল কালীদহে কাল-নাগ। পদ্মাদেবী তাকে ডেকে আরো কিছু বিষ দান করলেন, তারপর আদেশ দিলেন—"চুপে চুপে গিয়ে লক্ষ্মীন্দরকে দংশন কর।" বিনোদ কর্মকার লোহার ঘরের কোন্ দিকে যে গোপন-ছিদ্র করে' রেখেছে, সে কথাও তাকে জানিয়ে দিলেন।

এদিকে বাসরঘরে লক্ষ্মীন্দর বেহুলার সঙ্গে কিছুক্ষণ পাশা খেললেন। পাশা খেলতে খেলতে তাঁর পেল ভীষণ ক্ষুধা। লোহার

ঘরে খাবারের ব্যবস্থা বিশেষ কিছু ছিল না। কিছু আতপ চা'ল আর কয়েকটি নারিকেল ছিল।

বুদ্ধিমতী বেহুলা তাই দিয়েই কিছু খাবার তৈরি করে' দিলেন। সেই খাবার খেয়ে লক্ষ্মীন্দরের পেল বেজায় ঘুম। ঘুমে যেন তাঁর চোখ দুটি ভেঙে আসতে লাগল। লক্ষ্মীন্দর বেহুলাকে বল্লেন, "আর জেগে থাকতে পারছি না। ঘুমে আমার চোখ জড়িয়ে আসছে।"

বেহুলা বল্লেন, "বেশ, তুমি কিছুক্ষণ ঘুমাও। আমি জেগে বসে' তোমাকে পাহারা দেব। একে লোহার ঘর, তার উপরে বাইরে সজাগ প্রহরীর দল। ঘরের আশে-পাশে সাপের শত্রু ময়ূরের পাল ঘুরে বেড়াচ্ছে। তোমার কোনো ভয় নেই।"

অল্পক্ষণের মধ্যেই লক্ষ্মীন্দর গাঢ় ঘুমে অচেতন হয়ে পড়লেন। আর বেহুলা জেগে জেগে স্বামীকে পাহারা দিতে লাগলেন।

এইভাবে কিছুক্ষণ গেলে বেহুলার চোখেও যেন নেমে এলো সাত-রাজ্যের ঘুম। স্বয়ং নিদ্রাদেবী এসে বেহুলার চোখে ভর করলেন। তিনি পালঙ্কের উপর স্বামীর পাশে গাঢ় ঘুমে অচেতন হয়ে পড়লেন। এও যে মনসাদেবীর মায়া তা কেউ বুঝল না।

শুধু তাই নয়, মনসার আদেশে স্বয়ং নিদ্রাদেবী চম্পক-নগরে এসে ভর করলেন। যত পাইক প্রহরী ছিল তারাও ক্রমে ক্রমে ঢলে' পড়ল। এমন কি ময়ূরের দলও ঘাড় গুঁজে গভীর নিদ্রায় অভিভূত হোলো।

এই মহা-সুযোগে কাল-নাগ এসে হাজির হোলো চম্পক-নগরে। তারপর চুপে চুপে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে অতি সন্তর্পণে সেই গোপন-ছিদ্র দিয়ে লোহার বাসরঘরে প্রবেশ করল। ঘরে ঢুকেই কাল-নাগ একবার ফণা তুলে

তাকিয়ে দেখল ঘুমন্ত লক্ষ্মীন্দর আর বেহুলার দিকে—তারপর একটা দুষ্টু- হাসি হেসে ঘুমন্ত-লক্ষ্মীন্দরের পায়ে দিল মরণ-কামড়।

কামড় খেয়ে লক্ষ্মীন্দর ধড়ফড় করে' জেগে উঠলেন। দেখলেন প্রকাণ্ড এক কাল-নাগ ঝড়ের মত ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছে।

তৎক্ষণাৎ তিনি তাকে তাড়া করে তার লেজ ধরে' ফেল্লেন, আর তীক্ষ্ণ অস্ত্র দিয়ে লেজের কিছুটা অংশ কেটে রাখলেন। লেজে-কাটা সাপ মুহূর্তের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

এরপর লক্ষ্মীন্দর বেহুলাকে জাগাবার অনেক চেষ্টা করলেন, ধাক্কা মারলেন, কিন্তু বেহুলার ঘুম সে রাত্রে আর ভাঙল না।

লক্ষ্মীন্দর বুঝলেন, বেহুলার এ ঘুম সামান্য ঘুম নয়, মনসার আদেশে স্বয়ং নিদ্রাদেবী তাঁর চোখে ভর করেছেন। এ ঘুম ভাঙান সহজ নয়।

লক্ষ্মীন্দর নিরুপায় হয়ে বাসরঘরের লোহার দরজা খুলবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু সে বিরাট ভারী দরজা কিছুতেই খোলা গেল না।

এদিকে কালকূট বিষ ক্রমেই তাঁর শরীরটাকে অবশ করে' ফেলছে। মাথাটা ঝিম্ ঝিম্ করছে,—চোখের দৃষ্টি ঝাপ্‌সা হয়ে আসছে, অবশেষে তিনি বিষের জ্বালায় মৃত্যুর কোলে ঢলে' পড়লেন।

————

কলার ভেলায়

ভোরবেলা বেহুলার ঘুম ভাঙল। তিনি যে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলেন তা তাঁর খেয়াল নেই।

তাড়াতাড়ি উঠে স্বামীকে জাগাতে গিয়ে দেখলেন লক্ষ্মীন্দরের শরীর পাথরের মত ঠাণ্ডা। চোখ দুটো তাঁর উল্টে আছে। জীবনের কোনো সাড়া নেই। তিনি অনেক ঠেলাঠেলি করলেন, অনেক ডাকাডাকি করলেন, দুই হাত ধরে' ওঠাতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু সমস্তই বৃথা হোলো। লক্ষ্মীন্দর নির্জীব হয়ে পড়ে' রইলেন।

বেহুলা বুঝতে পারলেন তাঁর সর্বনাশ হয়ে গেছে। স্বামী আর বেঁচে নেই।

তিনি আকুল হয়ে কাঁদতে লাগলেন, নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে লাগলেন। তিনি পাগলিনীর মত অস্থির হয়ে উঠলেন।

হঠাৎ বেহুলার চোখে পড়ল পালঙ্কের উপর সাপের এক টুক্‌রো লেজ পড়ে' আছে। বুঝতে তাঁর বাকি রইল না, এই সাপের দংশনেই তাঁর স্বামীর মৃত্যু হয়েছে!

বেহুলা তখন সাপের সেই লেজটুকু নিজের সাড়ীর আঁচলে বেঁধে নিলেন, তারপর সিঁথির সিঁদুর ফেল্লেন মুছে। শরীরে তাঁর যে সব

মূল্যবান্ অলঙ্কার ছিল, তাও একটি একটি করে' খুলে ফেলে বিধবার বেশ ধারণ করলেন।

দেখতে দেখতে এই সর্বনেশে কথা চারিধারে ছড়িয়ে পড়ল। চাঁদ-সওদাগর আর সুনুকা রাণী এই খবর পেয়ে পাগলের মত হয়ে উঠলেন।

পুত্রশোকে সুনুকা দেবী অজ্ঞান হয়ে পড়ে' গেলেন, চাঁদ-সওদাগর চোখে অন্ধকার দেখতে লাগলেন। তিনি 'হা লক্ষ্মীন্দর, হা লক্ষ্মীন্দর' বলে' কাঁদতে কাঁদতে ধূলায় লুটাতে লাগলেন।

সারা রাজ্যে যেন শোকের ঝড় বইতে লাগল। চাঁদ-সওদাগরের প্রজারা সকলে চোখের জলে বুক ভাসাতে লাগল। কারুর মুখে আর হাসি নেই। সবাই বুক চাপড়ায়' আর 'হায় হায়' করে। লক্ষ্মীন্দর যে ছিলেন তাদের বড়ই প্রিয়, বড় আদরের ধন!

চাঁদ-সওদাগর আরো ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন মনসাদেবীর উপর। মনসাদেবীর চক্রান্তেই যে লক্ষ্মীন্দরের মৃত্যু হয়েছে সে বিষয়ে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ রইল না। কিন্তু কি করে' যে এই দুর্ভেদ্য লোহার বাসরে সাপ প্রবেশ করল, তা তিনি বুঝে উঠতে পারলেন না। স্থির করলেন মনসাকে এর প্রতিফল দিতেই হবে।

বেহুলা শ্বশুর-শাশুড়ীর শোক সহ্য করতে না পেরে বল্লেন, "ভগবান অকালে আমার সর্বনাশ করলেন। আমি স্বামীর মৃতদেহ নিয়ে স্বর্গে দেবতাদের কাছে যাব। তারপর সেখানে তাঁদের কাছে নেচে গেয়ে তাঁদের সন্তুষ্ট করে পতির প্রাণভিক্ষা চাইব। দেবতাদের কৃপায় আমার স্বামী আবার প্রাণ ফিরে পাবেন। আমার দৃঢ়বিশ্বাস, আমি কিছুতেই বিধবা হয়ে থাকব না।"

বেহুলার কথা চাঁদ-সওদাগর বিশ্বাস করতে পারলেন না। স্বর্গে গিয়ে
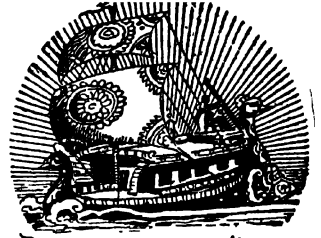
মৃত-স্বামীকে বেহুলা ফের বাঁচিয়ে আনবেন, এ কথা কেমন করে' তিনি বিশ্বাস করেন ! তিনি ভাবলেন, স্বামীর শোকে বেহুলা পাগলিনী হয়ে গেছেন।

পুত্রবধূকে এইভাবে বিদায় দিয়ে সুনুকার মন উঠছে না। তিনি বল্লেন, "যা হবার তাই হয়ে গেছে, আমাদের কাছ থেকেই তুমি দেবতাদের আরাধনা কর। ভক্তিতে সব হয় মা। লক্ষ্মীন্দরও বেঁচে উঠতে পারে। প্রাণ থাকতে স্বর্গে যাওয়া কি সম্ভব মা ?"

কিন্তু বেহুলা কারুর কথাই শুনতে চাইলেন না। তিনি বল্লেন, "আমার স্বামীর মৃতদেহ নিয়ে স্বর্গে আমি যাবই। আমার বিশ্বাস, এতেই আমার মনের বাসনা পূর্ণ হবে।"

যাই হোক্, তবু অনিচ্ছা সত্ত্বেও চাঁদ বেহুলার এই কাজে মত দিলেন।

তিনি জানতেন বারণ করলে বেহুলা কিছুতেই শুনবেন না।

তারপর একদিন কলার ভেলা নদীতে ভাসিয়ে বেহুলা তার উপরে স্বামীর মৃতদেহ কোলে করে' বসলেন।

নদীর প্রবল স্রোতে ভেসে চল্ল কলার ভেলা শোঁ শোঁ করে' অজানার উদ্দেশে।

বাঘের কবলে

বেহুলা মৃত-স্বামীকে নিয়ে কলার ভেলায় ভেসে গেলেন। চাঁদ-সওদাগর আর সনুকা দেবী তাঁকে অনেক করে’ বুঝিয়ে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু সবই হোলো বৃথা। বেহুলার স্থির বিশ্বাস, স্বর্গে দেবতাদের সন্তুষ্ট করে’ তিনি মৃত-পতিকে বাঁচিয়ে আনতে পারবেন।

চম্পক-নগরে শোকের ঝড় বয়ে’ চলেছে। সনুকার তো কথাই নেই। তাঁর স্নানাহার বন্ধ। কেবল তিনি ‘হা-হুতাশ’ করেন আর মাটিতে লুটিয়ে কাঁদেন। ছেলেকে তো হারিয়েছেনই, আবার পুত্রবধূকেও হারাতে হোলো।

চাঁদ-সওদাগরেরও আর কাজকর্মে মন নেই। কেবল মৃত-পুত্রের কথা ভাবেন, আর প্রাণভরে মনসাকে গালাগালি দেন।

এদিকে বেহুলার ভেলা ভাসতে ভাসতে একদিন সমুদ্রে এসে পড়ল।

মনসা তাঁকে পরীক্ষা করবার জন্যে একটা কৌশল অবলম্বন করলেন। বন্ধু নেতাকে ডেকে বল্লেন, “তুমি এক কাজ কর। তুমি বাঘের রূপ ধরে’ সমুদ্রের কূলে যাও, তারপর বেহুলার কাছ থেকে তাঁর মৃত-স্বামীকে খেতে চাও।”

মনসার কথায় নেতা তৎক্ষণাৎ ভয়ঙ্কর এক বাঘের মূর্তি ধারণ
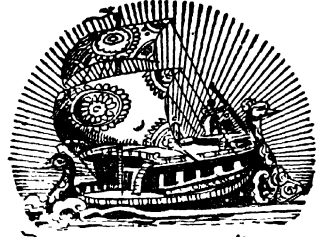
করলেন, আর ভীষণ গর্জন করতে করতে সমুদ্রের উপকূলে হাজির হলেন।

বেহুলার ভেলা যখন সমুদ্রের উপকূলে পৌঁছেছে, তখন ব্যাঘ্ররূপিণী নেতা তাঁকে ডেকে বল্লেন, "যদি ভালো চাও তো শীগ্‌গির তোমার মৃত-পতিকে আমায় দান কর। আমি অত্যন্ত ক্ষুধার্ত। যদি না দাও তবে তোমাকেও খেয়ে ফেলব।"

বাঘকে মানুষের মত কথা বলতে দেখে বেহুলার তো আশ্চর্যের সীমা নেই। তিনি বিনয় করে' হাত জোড় করে' বলতে লাগলেন, "ওহে বাঘ আমার মৃত-স্বামীকে কিছুতেই দিতে পারব না। তার চেয়ে তুমি যত ইচ্ছা আমার শরীর থেকে মাংস নিয়ে খেতে পার। তোমার যতক্ষণ ক্ষুধা দূর না হয়, ততক্ষণ আমার মাংস খাও।"

বেহুলার কথা শুনে বাঘ ভয়ঙ্কর হুঙ্কার ছাড়তে লাগল, বল্লে, "তুমি একজন সামান্য মেয়েমানুষ, তোমার তো সাহস কম নয়! ভালো চাও তো শীগ্‌গির আমার কথা শোনো। তোমার স্বামীকে দিয়ে দাও। না হলে এক্ষুণি জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে' মড়া টেনে নিয়ে আসব। তোমার সাধ্য নেই যে আমাকে বাধা দিতে পার। তোমার স্বামীকেও খাব, তারপর তোমাকেও খাব।"

বেহুলা অনুমানে বুঝতে পারলেন এই বাঘ হচ্ছে মনসাদেবীর চর। তিনি তাকে বল্লেন, "আমি বুঝতে পেরেছি তুমি মনসাদেবীর চর। যদি শীগ্‌গির এখান থেকে না পালাও তবে এক্ষুণি আমি. তোমাকে শাপ দিয়ে ভস্ম করে' দেব।'

বেহুলার কথা শুনে নেতা বুঝলেন, তিনি ধরা পড়ে' গেছেন। তাঁর চাতুরি আর খাটবে না। তাই বেহুলার শাপের ভয়ে তিনি মানে মানে সরে' পড়লেন!

মনসার কাছে গিয়ে নেতা তখন তাঁকে সমস্ত কথা খুলে বল্লেন। সকল কথা শুনে মনসাদেবী বল্লেন, "সত্যি বেহুলার মত সতী আর ত্রিভুবনে নেই। তার শ্বশুর চাঁদের শত্রুতার জন্যেই আমায় এই সব কু-কীর্তি করতে হচ্ছে। নইলে বেহুলা বা লক্ষ্মীন্দরের উপর আমার একটুও রাগ নেই। চন্দ্রধরকে শাস্তি দেবার জন্যেই আমার এই সব ব্যবস্থা।" তিনি খুশী হয়ে মনে মনে বেহুলাকে আশীর্বাদ করলেন।

বাঘের হাত থেকে নিস্তার পেয়ে আবার চল্লেন বেহুলা অথৈ সমুদ্রের জলে তাঁর ভেলা ভাসিয়ে।

মন তাঁর উৎসাহে ভরা, সামনে যেন আশার আলো ঝলমল্ করছে। তাঁর মনে প্রগাঢ় বিশ্বাস হয়েছে, এ অন্ধকার দূর হবেই,—একদিন সমস্ত দুঃখ-দুর্যোগের অবসানে জ্যোতির্ম্ময় আনন্দ-রশ্মি, তাঁর ভবিষ্যৎ-জীবন-পথটা আলোকিত করে তুলবেই।

তা'রা বেহুলাকে প্রশ্নবাণে অস্থির ক'রে তুল্‌ল।
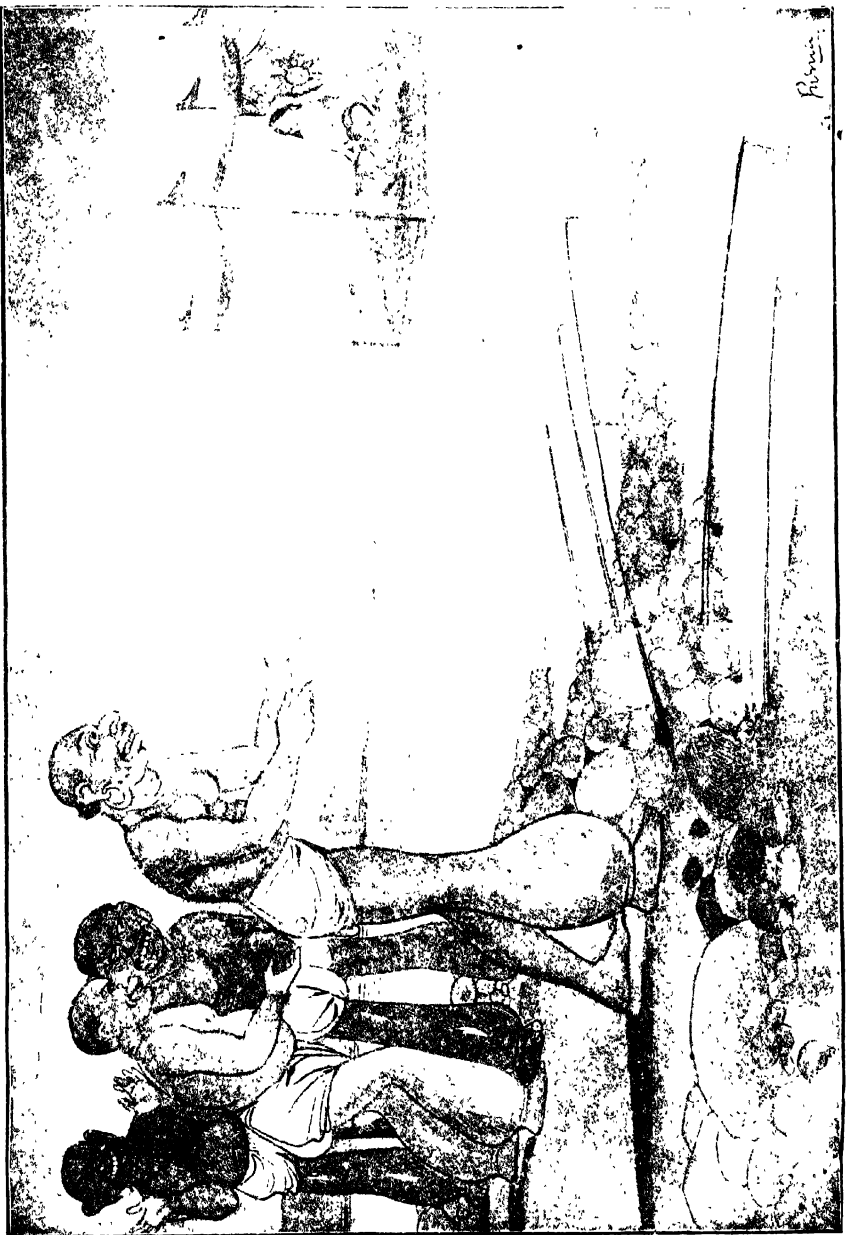
সমুদ্রের তীরে ছিল এক অদ্ভুত নগর। সেই নগরে বাস করত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তালগাছের মত সব লোক। ভয়ঙ্কর চেহারা তাদের। দেখলে ভয়ে প্রাণ উড়ে যায়। অতি অদ্ভুত ধরণের লোক তারা। রাক্ষসের মত বিকট আর বিরাট চেহারা, পায়ে মস্ত মস্ত গোদ। তার উপর আবার মাথাভরা টাক তাদের।

সাত ভাই বাস করে এই নগরে। বড় বড় শাল গাছের ছিপ বানিয়ে তারা সমুদ্রে মাছ ধরে। তাদের টোপ হচ্ছে মরা-গরু। বাস্তবিক তাদের চেহারা দেখলে ভয় হয়,—এতই ভীষণ দেখতে তারা।

একদিন এই সাত-ভাই গোদা সমুদ্রের কূলে মাছ ধরছে এমন সময় তারা দেখতে পেল তাদের দিকে একটা ভেলা ভেসে আসছে।

তারা ভাল করে' লক্ষ্য করে' দেখল, ভেলার উপর একটি মৃতদেহকে কোলে করে' বসে' আছে একটি পরমাসুন্দরী মেয়ে।

এই দৃশ্য দেখে সাত-ভাই তো অবাক্! এই মেয়েটি যে বেহুলা, সে কথা তো আর তারা জানে না।

ভেলা আরো কাছে এলে তারা বেহুলাকে নানারকম প্রশ্নবাণে অস্থির করে' তুল্ল।

বেহুলা বল্লেন, "আমি স্বামীর প্রাণ ভিক্ষা করতে দেবতাদের কাছে স্বর্গে যাচ্ছি।"

বেহুলার কথা শুনে গোদার দল তো আর হেসেই বাঁচে না। এও কি আবার সম্ভব নাকি! মরা-মানুষ বাঁচানো কি সামান্য মানুষের কাজ!

বেহুলার রূপ দেখে তাদের বড় ভাই একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেছিল। সে নানা রকম ভাবে বেহুলাকে বুঝাতে লাগল, বেহুলা যদি তাকে বিয়ে করে, তবে সে পরম সুখে থাকবে। গোদার ধনজনের কোনো অভাব নেই কোনো দিন বেহুলার খাওয়া-পরার কোনো কষ্ট হবে না।

গোদার কথা শুনে বেহুলার ভারি মজা বোধ হোলো। তিনি বল্লেন, "আমি যখন স্বামীকে বাঁচিয়ে আবার ফিরে আসব, তখন সাতটি সুন্দরী যোগাড় করে' তোমাদের সঙ্গে বিয়ে দেব। তোমরা সব যে এক-একটি বুদ্ধিমানের ঢেঁকী, তা আমি বেশ বুঝতে পেরেছি। কিছুদিন অপেক্ষা কর, ছয় মাসের মধ্যেই আমি ফিরে এসে তোমাদের বিয়ে দেব।"

বেহুলার কথা শুনে গোদার দল সন্তুষ্ট হতে পারল না, তারা বেহুলাকে ধরবার জন্যে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

তখন আর উপায় না দেখে সতী বেহুলা তাদের অভিশাপ দিলেন: "ওরে গোদার দল, আমি যতদিন স্বামীকে বাঁচিয়ে না ফিরে আসি, ততদিন তোরা জলের মধ্যে এইভাবে বন্দী হয়ে থাক্!"

অবাক্ কাণ্ড, এই কথা বলামাত্র গোদারা সাত-ভাই জলে মরা-গরুর মত ভাসতে লাগল। তারা আর কূলে উঠতে পারল না।

জুয়াড়ীর পরিবর্তন

বেহুলা আবার ভেলা ভাসিয়ে চলেছেন সমুদ্রের জলে, হঠাৎ একদিন দেখতে পেলেন, একজন লোক সমুদ্রের কূলে এসে উপস্থিত হয়েছে।

বেহুলা তার পরিচয় পেয়ে জানলেন,—লোকটি একসময়ে একজন মহা ধনবান্ লোক ছিল। তার হাতীশালে হাতী ছিল, ঘোড়াশালে ঘোড়া ছিল, ধনজন লোক-লস্কর কিছুরই কোনো অভাব ছিল না। ক্রমে জুয়ার আড্ডায় পড়ে লোকটি তার সমস্ত সম্পত্তি নষ্ট করেছে, এমন কি এখন অনাহারে তার দিন কাটছে। জীবনের উপর সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে সে আজ সমুদ্রের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে' আত্মহত্যা করতে এখানে হাজির হয়েছে।

তার কাছে দুঃখের কাহিনী শুনে দয়াবতী বেহুলার মন গলে' গেল। তিনি তাঁর হাতের একটি রত্নের আংটি খুলে লোকটিকে দান করলেন, আর বল্লেন, "এই আংটিটি নিয়ে যাও, এতে তোমার দুঃখ-দুর্দশা দূর হবে। তুমি অবিলম্বে দেশে ফিরে যাও। এই আংটি বিক্রী করে' যে অর্থ পাবে, তাই দিয়ে আবার জুয়া আর পাশা খেলো। আবার তুমি তোমার আগের অবস্থা ফিরে পাবে।"

আংটিটি পেয়ে জুয়াড়ী মনের আনন্দে আবার বাড়ী ফিরে গেল, বেহুলাও আবার চল্লেন অকূল সমুদ্রে ভেসে।

এদিকে জুয়াড়ী দেশে ফিরে এসে সেই রত্নের আংটিটি বিক্রী করে' লক্ষ মুদ্রা লাভ করল, তারপর বেহুলার উপদেশমত সেই অর্থ দিয়ে আবার জুয়া আর পাশা খেলতে লাগল!

বেহুলার কথা আশ্চর্যভাবে ফলে' গেল! এবার তার জুয়ায় জয় হতে লাগল, সে বহু অর্থ পেতে লাগল, আর তার হারানো যশ আর মান আবার ফিরে আসতে লাগল।

জুয়াড়ীর পূর্ব্বের অবস্থা আবার ফিরে এলো। তার হাতীশালে হাতী, ঘোড়াশালে ঘোড়া গম্‌গম্‌ করতে লাগল। কুবেরের মত অতুল সম্পত্তির অধিকারী হয়ে সে আবার সুখে বাস করতে লাগল।

এ যে সেই সতী-কন্যার আশীর্বাদের ফলে হয়েছে, সে কথা সে ভুলতে পারল না। সে বেহুলাকে স্বর্গের কোন দেবী বলেই মনে করল। না হলে, সে যখন সমুদ্রের জলে আত্মহত্যা করতে গেছিল, তখন হঠাৎ তাঁরই বা আবির্ভাব হবে কেন,—আর তাকে রত্নের আংটি দিয়ে তিনি আশীর্বাদই বা করবেন কেন?

এ নিশ্চয় মা-ভগবতীর কৃপা। সেই থেকে জুয়াড়ীর মনের পরিবর্তন হোলো, সে চিরদিনের মত জুয়াখেলা ছেড়ে দিল।

ধনা-মনার যুদ্ধ
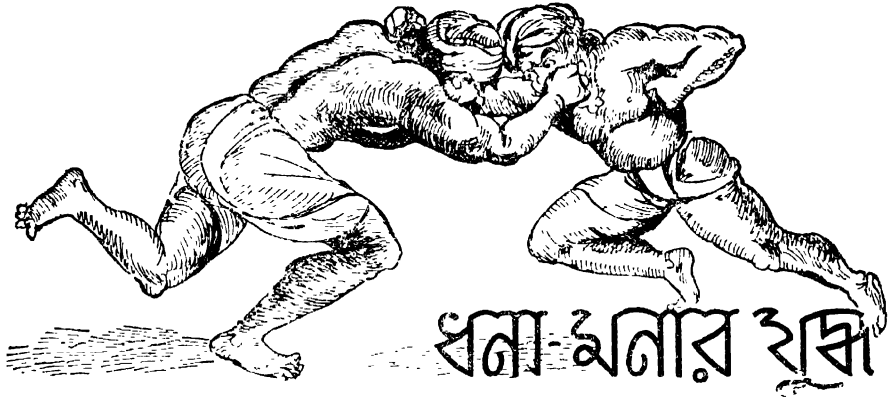
বেহুলার ভেলা ভাসতে ভাসতে এবার এক দানবপুরীর কাছ দিয়ে চল্ল। এই দানবপুরীতে বাস করত ধনা ও মনা নামে দুই দানবরাজা।

তারা ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী, মল্লযুদ্ধে অতিশয় পটু। তারা সমুদ্রের তীরে বাস করত, আর কোন বাণিজ্যের তরী দেখলে তার ধনরত্ন লুট করে' নৌকা জলে ডুবিয়ে দিত।

এইভাবে তারা যে কত সওদাগরের সর্বনাশ করেছে তার আর সীমা-সংখ্যা নেই। তাদের সঙ্গে সহজে কেউ পেরে উঠত না।

বেহুলার ভেলা সমুদ্রে ভেসে চলেছে, হঠাৎ ধনা-মনার নজর পড়ল সেই-দিকে। ভেলার উপর পরমাসুন্দরী একটি মেয়েকে দেখে তারা অবাক্ হয়ে গেল। মেয়েটির রূপে যেন চারিধার উজ্জ্বল হয়ে আছে।

বেহুলাকে দেখে মনা বলে' উঠল, "আমি এই মেয়েটিকে বিয়ে করব।"

ধনা হুঙ্কার ছেড়ে বল্লে, "তা কখনো হতে পারে না, এই মেয়েটি আমারই উপযুক্ত।"

এই রকম ভাবে কথা-কাটাকাটি হতে হতে লেগে গেল দুই ভাইয়ের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ। কিল, চড়, লাথি, ঘুঁসি, কামড়াকামড়ি, কিছুই আর বাদ গেল না।

একবার ধনা জয়ী হয়, তার পর মুহূর্তেই আবার মনা তাকে কাবু করে' ফেলে।

সমুদ্রের তীরে দুই দানবকে এই ভাবে যুদ্ধ করতে দেখে বেহুলা তাড়াতাড়ি তাঁর ভেলার গতি বাড়িয়ে দিলেন। তাদের অদ্ভুত চেহারা আর উৎকট ভাবভঙ্গি দেখে তাঁর বেশ ভয় হোল।

বেহুলাকে এই ভাবে হাতছাড়া হতে দেখে ধনা-মনা তাঁকে ডাকতে লাগল, "ওগো মেয়ে, শোনো শোনো। কেন সমুদ্রের জলে ডুবে মরবে। তার চেয়ে আমাদের কাছে এসো। আমাদের মধ্যে যাকে পছন্দ হয় তাকে বিয়ে করে' এই দানবপুরীতে সুখে বাস কর। আর ঐ ভেলার মড়াটা সাগরের জলে ফেলে দাও। আরে ছোঃ, ভূত-পেরেতেরা মড়া আগ্‌লে বসে' থাকে, তুমি তো সাক্ষাৎ দেবী। এসো আমাদের কাছে।"

তাদের এসব কথায় বেহুলার মনে অত্যন্ত ভয় হোলো। তিনি তাদের অভিশাপ দিলেনঃ "তোমরা সন্ধ্যা পর্যন্ত এইভাবে মল্লযুদ্ধ করতে থাক। সূর্যাস্তের পর তোমাদের এই যুদ্ধের শেষ হবে।"

এই অভিশাপ দিয়ে বেহুলা তাড়াতাড়ি সেখান থেকে প্রস্থান করলেন। আর ধনা-মনা দুই ভাই সারাদিন ভীষণভাবে মল্লযুদ্ধ করতে লাগল।

তারপর সন্ধ্যার সময় যখন সূর্যাস্ত হোলো, দুই ভাই ক্লান্ত হয়ে সমুদ্রের ধারে জড়াজড়ি করে' পড়ে' রইল। তাদের আর নড়্‌বার চড়্‌বার ক্ষমতা রইল না। পরের দিন ভোর বেলা তারা বাড়ী ফিরল।

এবার' বেহুলা উপস্থিত হলেন এক অপ্সরীদের দেশের কাছে। নদীর তীরে অপ্সরীদের সুন্দর নগর, সেখানে মনের সুখে বাস করে অপ্সরীর দল।

অপ্সরীরা বেহুলাকে ভেসে যেতে দেখে, তাঁকে ডেকে নানা রকম প্রশ্ন করতে লাগলেন।

বেহুলার মুখে সমস্ত কথা শুনে অপ্সরীরা খুসী হয়ে তাঁকে আশীর্বাদ করলেন আর তাঁকে তীরে উঠে মনসা-পঞ্চমীর ব্রত করতে বল্লেন।

তাঁদের কথামত বেহুলা তখনি তীরে উঠে ভক্তিভরে মনসা-পঞ্চমীর ব্রত শেষ করলেন।

অপ্সরীরা বল্লেন, "এই ব্রত কখনো নিষ্ফল হয় না। এই ব্রতের ফলে তোমার স্বামী নিশ্চয় আবার প্রাণ ফিরে পাবেন।"

ব্রত শেষ করে' বেহুলা আবার ভেলাতে উঠলেন। বেহুলার ভেলা আবার ভেসে চল্ল।

সীমাহারা অসীম সাগর। চারিধারে থৈ থৈ করছে নীল জলের রাশি, কোনো দিকে কূলকিনারা নেই।

সেই ভেলায় স্বামীর মৃতদেহ আগ্‌লে বসে' সামনের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছেন বেহুলা। স্বর্গের পথ—সে কতদূর—কে জানে?

————

নেতার বাড়ীতে

এভাবে কতদিন কেটে গেল।

এদিকে লক্ষ্মীন্দরের শরীর ভীষণভাবে পচতে আরম্ভ করেছে। দুর্গন্ধে আর টেকা যায় না। তাঁর শরীরের মাংসগুলি সব খসে' খসে' পড়্‌তে লাগল। এখন লক্ষ্মীন্দরের বিকৃত-চেহারা দেখলে ভয়ে প্রাণ কেঁপে ওঠে।

ক্রমে হলো কি, শরীরে শুধু অস্থি ছাড়া আর কিছুই রইল না, পড়ে' রইল শুধু একখানি কঙ্কাল।

বেহুলা এবার চিন্তায় আকুল, কি করে' শুধু স্বামীর এই কঙ্কালখানি নিয়ে তিনি দেবপুরে যাবেন? তাঁর স্বামী কি আর বাঁচবেন? হায় হায় হায় এতদিন যেটুকু আশা-ভরসা তাঁর মনের কোণায় জমা ছিল—এখন তা' বুঝি নির্মূল হোলো।

এই ভাবতে ভাবতে বেহুলার শরীর অবশ হয়ে গেল, তিনি একদিন ভেলার উপর অজ্ঞান হয়ে পড়লেন।

সেই অজ্ঞান অবস্থায় তিনি স্বপ্ন দেখলেন, যেন মনসাদেবী এসে বলছেন: "ওগো বেহুলা, তুমি স্থির হও, তোমার দুঃখের শেষ হবে।"

এই স্বপ্ন দেখে বেহুলা যেন অনেকটা ভরসা পেলেন, মন তাঁর অনেকটা শান্ত হোলো।
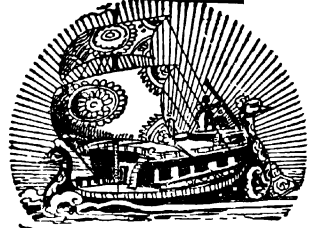
তিনি স্বামীর কঙ্কালটা ভালো করে' ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে' তাই নিয়ে আবার অকূল সমুদ্রে ভাসলেন।

চাঁদ-সওদাগর যদিও মনসার একজন ভীষণ শত্রু, বেহুলা কিন্তু মনসাকে বিশেষ ভক্তি করেন। প্রতি বিপদে তাঁকে স্মরণ করেন। তার বিশ্বাস, মনসার কৃপায় আবার তাঁর স্বামী জীবন ফিরে পাবেন।

মনসাদেবীও অন্তরে অন্তরে বেহুলাকে খুব স্নেহ করেন,—আর সব সময়েই বিপদ্ থেকে তাঁকে রক্ষা করতে চেষ্টা করেন। কিন্তু চাঁদ-সওদাগরের উপর তিনি হাড়ে-হাড়ে চটা। তাঁকে জব্দ করবার জন্যেই লক্ষীন্দরের তিনি এই অবস্থা করেছেন।

সমুদ্র ছাড়িয়ে ক্রমে বেহুলার ভেলা এসে পৌঁছালো ত্রিপুনী নদীর কূলে। তিন দিক্ থেকে তিনটি নদী এসে মিশেছে বলে' নাম হয়েছে "ত্রিপুনী"।

কোন্ নদীপথে তাঁর ভেলা ভাসাবেন স্থির করতে না পেরে বেহুলা তিনটি নদীর জলই মুখে দিয়ে দেখলেন। একটি নদীর জলে তিনি ক্ষারের দুর্গন্ধ পেলেন। অনুমানে বুঝলেন এই নদীর জলেই মনসাদেবীর সঙ্গী নেতা কাপড় কাচছেন। নেতা যে দেবতাদের কাপড় কাচেন, বেহুলা তা জানতেন।

বেহুলার অনুমানই ঠিক। কিছুদূরে এগিয়ে গিয়ে তিনি দেখলেন নদী-তীরে নেতা একমনে দেবতাদের কাপড় কাচছেন।

বেহুলা জানতেন নেতা মনসাদেবীর সহচরী আর তাঁর খুব প্রিয়পাত্রী।

বেহুলা তাড়াতাড়ি তীরে উঠে নেতার পায়ে ধরে' কাঁদতে কাঁদতে নিজের মনের দুঃখ জানাতে লাগলেন: "ওগো মাসী, তোমার কাছে দুঃখের কথা কি আর বলব! আমি অতি অভাগিনী; মৃত-স্বামীকে বাঁচাবার

জন্যে দেবতাদের কাছে যাচ্ছি। তুমি আমাকে এ বিষয়ে সাহায্য কর। আমাকে দেবতাদের কাছে নিয়ে চল!”

অভাগিনী বেহুলার দুঃখে নেতার মন গলে' গেল। তিনি তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে অভয় দিলেন আর সঙ্গে করে' নিজের বাড়ীতে নিয়ে গেলেন।

পরদিন নেতাকে আবার দেবতাদের কাপড় কাচতে দেখে, বেহুলার ইচ্ছা হোলো কাপড় তিনিও কেচে দেন।

পাছে বেহুলা কাপড় কাচলে দেবতাদের কাপড় নষ্ট হয়ে যায়, তাই প্রথমে নেতা তাঁকে বারণ করলেন, কিন্তু বেহুলার অনুরোধ ঠেলতে না পেরে শেষ পর্যন্ত রাজি হলেন।

বেহুলার কাপড় কাচা এতই সুন্দর হোলো যে নেতাও তা' দেখে অবাক্ হয়ে গেলেন। এমন কাপড় তিনিও কাচতে পারেন কি না সন্দেহ।

নেতা খুব সন্তুষ্ট হয়ে বেহুলাকে যথেষ্ট আদর করলেন আর প্রাণভরে তাঁকে আশীর্বাদ করলেন।

বেহুলা যখন বল্লেন, “মাসী, আমাকে দেবতাদের কাছে নিয়ে চলো।”—নেতা উত্তর দেন, “একটু সবুর কর বেহুলা। যখন কথা দিয়েছি, সুযোগ-সুবিধা বুঝে নিশ্চয়ই তোমাকে স্বর্গের দেবতাদের কাছে নিয়ে যাব। তোমার মনের বাসনা অবশ্যই পূর্ণ হবে।”

নেতার কথা শুনে বেহুলাও চুপ করে' সুযোগের অপেক্ষা করতে থাকেন।

———

বেহুলার কাচা কাপড়চোপড় নিয়ে পরদিন নেতা শিবদুর্গার কাছে হাজির।

এত সুন্দর কাচা কাপড় দেখে শিব তো দস্তুরমত অবাক্ হয়ে গেলেন। তিনি নেতাকে প্রশ্ন করলেন, "ওগো নেতা, তুমি শীগ্‌গির আমাকে বল আজকের এই কাপড় কে কেচেছে! এ তোমার কাজ নয় নিশ্চয়ই।"

শিবের প্রশ্ন শুনে নেতা বল্লেন, "আমার ঘরে একজন নর্তকী এসেছে, অপূর্ব সুন্দর তার চেহারা। সেই এই সব কাপড় কেচে আমাকে সাহায্য করেছে।"

নেতার কথা শুনে ভোলানাথ শিব তো মহা খুসী। তিনি বল্লেন, "এই নর্তকীর নাচ দেখতে আমার খুব ইচ্ছা হচ্ছে। তুমি কালই তাকে দেবতাদের সভায় নিয়ে আসবে। আমরা সবাই মিলে তার নাচ দেখব। তার নাচ দেখে যদি আমরা সন্তুষ্ট হই, তবে সে যা বর চাইবে তাই তাকে দেব।"

শিবের কথায় নেতা রাজি হয়ে সটান পদ্মাদেবীর কাছে এসে উপস্থিত। পদ্মার কাপড়ও বেহুলা কেচেছিলেন। কাচা কাপড়ের সৌন্দর্য দেখে পদ্মাও আশ্চর্য হয়ে গেলেন।

তারপর তিনি যখন শুনলেন চাঁদ-সওদাগরের পুত্রবধূ বেহুলা তাঁর

কাপড় কেচেছেন, তখন তিনি রেগে টং। চাঁদ-সওদাগরের সম্পর্কে কোন কথা বললে হঠাৎ মনসাদেবীর মাথা গরম হয়ে যেত। বেহুলাকে তিনি ভালই বাসতেন, কিন্তু তিনি যে চাঁদ-সওদাগরের পুত্রবধূ হয়েছেন এটা তিনি যেন সহ্য করতে পারছেন না। কোন কথা না বলে' তিনি ঠাস্ করে' মারলেন নেতার মুখে এক চড়।

চড় খেয়ে নেতা কাঁদতে কাঁদতে বাড়ীতে চলে এলেন, আর বেহুলার জন্মেই তাঁর যে এই লাঞ্ছনা হয়েছে এই জন্মে মনে মনে বেশ বিরক্ত হলেন।

তাঁর মুখে সমস্ত কাহিনী শুনে বেহুলার মন দুঃখে ভরে' গেল। তিনি কাতর হয়ে নেতার পায়ে ধরে' ক্ষমা চাইলেন আর বল্লেন, "মাসী গো, আমার জন্মে তুমি অনেক দুঃখ পেলে, অনেক অপমান সহ্য করলে। তুমি দয়া করে' আমাকে এই বিপদ্ থেকে উদ্ধার করে' দাও। সমস্ত জগতে আমি তোমার গুণগান করে' বেড়াব। মনসাদেবীও তো আমাকে আশীর্বাদ করেছেন। তবে আজ হঠাৎ আমার উপর চট্‌লেন কেন বুঝতে পারছি না। মাসী, তুমি আমাকে বাঁচাও।"

অভাগিনী বেহুলার কাতর বচন শুনে নেতার মন দয়ায় গলে' গেল। তিনি তখন দেবপুরে নাচগানের ব্যবস্থা করবার জন্মে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

বেহুলা যদি নৃত্য-গীতে দেবতাদের খুসী করতে পারেন, তবে তাঁদের বরে তাঁর স্বামী আবার প্রাণ ফিরে পাবেন, এটা তিনি বেশ ভালোভাবেই জানতেন।

ইন্দ্রের পুরীতে দু'জন ওস্তাদ বাদ্যকর ছিলেন। নেতা ঠিক করলেন বেহুলার নাচের সঙ্গে তাঁরা বাজনা বাজাবেন।

এখন লক্ষীন্দর আর বেহুলার পূর্বজন্মের কথা আমাদের একটু

● বেহুলা-লক্ষীন্দরের পূর্বজন্মকথা ●

আলোচনা করা যাক। পূর্বজন্মে লক্ষ্মীন্দর ছিলেন অনিরুদ্ধ আর বেহুলা ছিলেন ঊষা।

একদিন দেবসভায় ঊষা নৃত্য করছিলেন, আর অনিরুদ্ধ বাজনা বাজাচ্ছিলেন। হঠাৎ তাঁদের তালভঙ্গ হওয়ায় ইন্দ্র বিরক্ত হয়ে তাঁদের অভিশাপ দিলেনঃ "ওরে পাপিষ্ঠ, এমন মজলিসটা তোরা এইভাবে ভেঙে দিলি! এইভাবে আমাকে অপমান কর্‌লি! আমি তোদের অভিশাপ দিলাম, তোরা পৃথিবীতে গিয়ে মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ কর্।"

এই অভিশাপ শুনে ভীত হয়ে ঊষা আর অনিরুদ্ধ ইন্দ্রের পায়ে লুটিয়ে পড়ে' ক্ষমা ভিক্ষা করলেন। তাঁরা কাতর হয়ে কাঁদতে কাঁদতে বল্লেন, "দেবরাজ আমাদের এই অনিচ্ছাকৃত ক্রটির জন্যে আমাদের এবারকার মত ক্ষমা করুন। এ রকম অন্যায় আর করব না।"

ইন্দ্র অভিশাপ দিয়ে ফেলেছেন, আর উপায় নেই। কথা তাঁর মিথ্যা হবার নয়। কাজেই ঊষা-অনিরুদ্ধের আকুল কান্নায় ইন্দ্রের মন ব্যাকুল হয়ে উঠল।

তখন তিনি বল্লেন, "যা হবার তা হয়ে গেছে, আমার শাপ মিথ্যা হবার নয়। তোমরা পদ্মাদেবীর সঙ্গে পৃথিবীতে যাও। আবার ষোলো বছর পর আমার কাছে ফিরে আসবে।"

এই ঊষা আর অনিরুদ্ধই পরে বেহুলা আর লক্ষ্মীন্দর রূপে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করলেন।

———

দেবসভায় বেহুলার নৃত্য

পরদিন নেতা বেহুলাকে নর্তকীর বেশে সাজাতে লাগলেন। সুন্দর করে' তাঁর চুল বেঁধে দিলেন; সাপের মত বেণী পড়ল তাঁর পিঠ ছাপিয়ে। কপালে দিলেন উজ্জ্বল সিঁদুরের ফোঁটা। কানে তাঁর কর্ণপুষ্প ঝল্‌মল্‌ করতে লাগল। গলায় দুল্‌তে লাগল গজমোতির মালা। সারা গায়ে দিব্যবস্ত্র জড়ালেন। এই পোষাকে বেহুলাকে যে কী চমৎকার মানাতে লাগল তা কি আর বলব!

কী সুন্দর মানিয়েছে বেহুলাকে! তাঁর নর্তকীর বেশ দেখে নেতাও মুগ্ধ হয়ে গেলেন। নিখুঁত সাজপোষাক হয়েছে তাঁর; একে তাঁর এত রূপ তার ওপর এই রকম সাজসজ্জা—স্বর্গের উর্বশী মেনকারাও বুঝি তাঁর কাছে হার মেনে যায়!

তারপর আর কি, তাঁকে সঙ্গে নিয়ে নেতা সটান হাজির হলেন কৈলাসে শিবের কাছে।

শিব তো বেহুলাকে দেখে রীতিমত অবাক্‌, বেহুলার রূপে তাঁর যেন তিনটি চোখই ধাঁধিয়ে উঠতে চায়।

তৎক্ষণাৎ ভোলানাথ নাচের আয়োজন করলেন আর সমস্ত দেবতাদের নিমন্ত্রণ করে' পাঠালেন।

নিমন্ত্রণ পেয়ে একে একে স্বর্গের সমস্ত দেবতাই আসতে লাগলেন। ব্রহ্মা এলেন, বিষ্ণু এলেন, ইন্দ্র এলেন, স্বর্গের যত দেব-দেবী কারুরই আর আসতে বাকী রইল না।

শুধু তাই নয়, গন্ধর্ব কিন্নর যক্ষ রক্ষ সবাই ভিড় করে' এসে সভা জাঁকিয়ে বসলেন। অপ্সরীরা সেজেগুজে সবাই এসে হাজির হলেন। স্বয়ং শিবের নিমন্ত্রণ, না এসে কি আর কেউ থাকতে পারেন?

সবাই হাজির, এলেন না শুধু পদ্মাদেবী। এই কথা জানতে পেরে শিব তৎক্ষণাৎ কার্তিক-গণেশ দু ভাইকে পাঠালেন পদ্মাকে আনতে।

পদ্মা তো কিছুতেই আসবেন না, জ্বরের ভান করে' পড়ে' রইলেন। শেষে অনেক অনুনয়বিনয় করার পর পদ্মা নাচের সভায় উপস্থিত হলেন।

পদ্মার মুখ বড়ই গম্ভীর, মনে হলো তিনি মনে মনে বড়ই চটে' আছেন। তাই দেখে অন্যান্য দেবতারা যেন একটু ভয়ই পেলেন।

পদ্মা চটে' গেলে না জানি এই আসরের মধ্যেই আবার কি একটা কাণ্ড ঘটে' যায়! সকলের মনেই এই চিন্তা।

শিব অনেক করে' তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে শান্ত করলেন। তারপর বেহুলাকে অনুরোধ করলেন নাচ আরম্ভ করতে।

বেহুলা উপস্থিত সমস্ত দেব-দেবীকে প্রণাম করে' নাচ আরম্ভ করলেন, বাদ্যকরেরা তালে তালে বাজনা বাজাতে লাগল।

বেহুলার অপূর্ব সাজপোষাক আর অপরূপ সৌন্দর্য দেখে দেবতারা প্রথম থেকেই মুগ্ধ হয়েছিলেন, তারপর যখন তিনি আশ্চর্য ভঙ্গি করে' নাচ সুরু করলেন, তখন তো আর কথাই নেই।

দেবতাদের সভায় যেন আনন্দের বন্যা বইতে লাগল। সবাই

প্রাণভরে বেহুলাকে তারিফ করতে লাগলেন। এমন নাচ তাঁরা আর কখনো দেখেননি।

এই নাচ দেখে অপ্সরীদের পর্যন্ত মাথা হেঁট হয়ে গেল। এমন যে পদ্মাবতী, তিনিও বেহুলার নাচ দেখে আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠলেন। তিনি বেহুলাকে ডেকে বল্লেন, "তোমার নাচ দেখে আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছি। আমি তোমাকে প্রচুর ধনরত্ন উপহার দিচ্ছি, তুমি তাই নিয়ে বাড়ী যাও।" এই বলে' মনসাদেবী বেহুলার সামনে বহু ধনরত্ন ফেলে দিলেন।

পদ্মার কথা শুনে বেহুলা তাঁর নৃত্য থামালেন, তারপর তিনি দেবতাদের উদ্দেশ্য করে' বল্লেন, "হে দেবগণ পদ্মাদেবীর কথায় আমার নাচ থামাতে হোলো। কিন্তু এই সব ধনরত্নে আমার কোনো প্রয়োজন নেই। আমি যা' চাই তাই যদি দান করেন তবে আমি কৃতার্থ হয়ে বাড়ী ফিরে যাব। না হলে' আপনাদের সামনেই আমি প্রাণ বিসর্জন করব। আপনাদের কৃপা না পেলে আমার বেঁচে থেকে দরকার নেই।" এই বলে' আবার তিনি নাচ স্বরু করলেন।

———

এবার বেহুলার নাচ হোলো আরো সুন্দর আরো মনোরম।

দেবতারা কাঠের পুতুলের মত নিশ্চল হয়ে সেই অপূর্ব সুন্দর নাচ উপভোগ করতে লাগলেন। কারুর যেন আর নিশ্বাস পর্যন্ত পড়ছে না, কারুর মুখে একটু শব্দ নেই। সকলে তাকিয়ে আছেন অবাক-বিস্ময়ে বেহুলার নৃত্যভঙ্গির দিকে। চোখের পলক পর্যন্ত যেন নিস্পন্দ হয়ে গেছে।

কিছুক্ষণ পর দেবরাজ ইন্দ্র অন্যান্য সকল দেবতাদের ডেকে বল্লেন, "হে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতি দেবগণ, আমরা সকলেই এই নর্তকীর নাচ দেখে পরম তৃপ্তিলাভ করেছি! এইবার ধনরত্ন দিয়ে তাঁকে বিদায় করুন।"

ইন্দ্রের কথা শুনে সবাই সযত্নে অতি আদরের সঙ্গে বেহুলাকে আসনে বসতে দিলেন, আর মহাদেব তাঁকে বল্লেন, "বাছা নর্তকী, আমরা সবাই তোমার চমৎকার নাচ দেখে খুব সন্তুষ্ট হয়েছি, এবার ইচ্ছামত ধন নিয়ে বাড়ী চলে' যাও।"

মহাদেবের কথা শুনে বেহুলা তাঁর আসন থেকে উঠে দাঁড়ালেন, তারপর হাত জোড় করে' দেবতাদের উদ্দেশ্য করে' বলতে লাগলেন, "হে স্বর্গের

দেবতারা, আমি অতি দুঃখিনী, পৃথিবীতে আমার সমান অভাগিনী আর কেউ নেই। আমি বহুকষ্টে পৃথিবী থেকে এই স্বর্গে এসেছি আপনাদের সন্তুষ্ট করবার জন্যে। আপনারা যদি বাস্তবিকই আমার উপর সন্তুষ্ট হয়ে থাকেন, তবে দয়া করে' আমায় মনের বাসনা পূর্ণ করুন। আমাকে বর দান করুন। এ সব ধনরত্ন আমি চাই না।"

বেহুলার মধুর গলার স্বরে দেবতাদের যেন কান জুড়িয়ে গেল। তাঁর দুঃখের আবেদন শুনে তাঁরা বিচলিত হয়ে উঠলেন। তাঁরা তাঁকে ইচ্ছামত বর দিতে প্রস্তুত হলেন।

তখন বেহুলা বল্লেন, "যদি আপনারা সত্য সত্যই আমার কথা রাখবেন বলে' অঙ্গীকার করতে পারেন, তবে আমি বর প্রার্থনা করি।"

বেহুলার কথায় দেবতারা অঙ্গীকার করলেন। তখন বেহুলা বল্লেন, "হে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, আমি আপনাদের কাছ থেকে ধনরত্ন কিছুই চাই না। আপনারা আমার মৃত-পতির জীবন দান করুন। এই বরই আমি আপনাদের কাছে প্রার্থনা করছি।"

বেহুলার এই কথা শুনে দেব-পঞ্চানন তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন, আর তাঁর দুঃখের কাহিনী শুনতে চাইলেন।

বেহুলাও দেবতাদের সামনে আগাগোড়া তাঁর জীবনের ইতিহাস ভেঙে বল্লেন। পদ্মার সঙ্গে তাঁর শ্বশুর চাঁদ-সওদাগরের ঝগড়া, চাঁদের ছয় পুত্র বধ, চাঁদের আরো দুর্গতি, তাঁর লক্ষীন্দরের সঙ্গে বিয়ে, লোহার-বাসরে স্বামীর মৃত্যু,—এই সমস্ত ঘটনাই বেহুলা একে একে বর্ণনা করলেন অতি করুণভাবে। তারপর তিনি যে পূর্বজন্মের ঊষা আর তাঁর স্বামী যে অনিরুদ্ধ, এ কথাও জানাতে বাকী রাখলেন না।

● বেহুলার বর প্রার্থনা ●

তাঁর স্বামীকে সাপে কামড়ে মেরেছে শুনে দেবতাদের মধ্যে কানাকানি আরম্ভ হোলো।

মহাদেব বেহুলাকে প্রশ্ন করলেন, "আহা বাছা, তোমার দুঃখের কথা শুনে আমাদের প্রাণ গলে' গেছে। তুমি বলতে পার কোন্ সাপে তোমার স্বামীকে এইভাবে মেরেছে? সেই সাপকে তুমি চিনতে পারবে কি?"

মহাদেবের প্রশ্ন শুনে বেহুলা বল্লেন, "সে সাপকে আমি চিনি না, তবে এটা জানি, সে সাপ মনসাদেবীর সাপ।"

মনসাদেবী সভাতেই উপস্থিত ছিলেন। বেহুলার কথা শুনে তিনি যেন একেবারে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন।

বেহুলাকে যথেষ্ট গালাগালি দিয়ে তিনি মহাদেবকে বল্লেন, "এই নর্তকার কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। সে মিছামিছি আমার নামে অপবাদ দিচ্ছে।" তারপর দেবতাদের ডেকে বল্লেন, "হে দেবগণ, সকলে মিলে এর বিচার কর। যদি এই নর্তকী প্রমাণ দিতে পারে যে আমার সাপে লক্ষ্মীন্দরকে মেরেছে, তবে এই সভার মধ্যেই আমি লক্ষ্মীন্দরকে বাঁচিয়ে দেব। আর প্রমাণ দিতে না পারলে, আমি এই নর্তকীরও প্রাণসংহার করব।"

বেহুলা তখন দেবতাদের বল্লেন, "মনসার সমস্ত সাপদের এখানে হাজির করা হোক, তারপর আমি প্রমাণ করে' দেব আমার কথা ঠিক কি না।"

মনসাদেবী বেহুলার কথায় রাজি হয়ে তাঁর অধীনে যত সাপ আছে, তাদের সকলকে সভায় নিয়ে এলেন।

তাদের মধ্যে একটি সাপের ছিল লেজ কাটা। বেহুলা তখন তাঁর আঁচলের কোণ থেকে সেই টুক্‌রোটুকু খুলে প্রমাণ করে' দিলেন, ঐ লেজকাটা সাপই লক্ষ্মীন্দরকে কামড়েছিল।

লক্ষ্মীন্দর তার ঐ লেজটুকু কেটে রেখে-ছিলেন। দেবতারা ভালো করে' পরীক্ষা করে' লেজের অংশটুকু মেপে দেখলেন বাস্তবিকই বেহুলার কথাই ঠিক।

মহাদেব মনসাদেবীকে উদ্দেশ্য করে' বল্লেন, "ছি-ছি মনসা, তুমি দোষ করেও দোষ স্বীকার করতে চাইছ না কেন! তোমার পাঠানো সাপেই যে লক্ষ্মীন্দরকে কামড়েছে এতে আর কোনো সন্দেহ নেই। এখন নিজের দোষ স্বীকার করে' লক্ষ্মীন্দরের প্রাণ ফিরিয়ে দাও।"

মহাদেবের কথায় অন্যান্য দেবতারাও সায় দিলেন আর মনসাদেবীকে অনুরোধ করলেন লক্ষ্মীন্দরকে বাঁচিয়ে দিতে।

বেহুলাও পদ্মাদেবীর আসনের কাছে হাঁটু গেড়ে বসে' জোড় হাতে তাঁর পতির প্রাণ ভিক্ষা চাইতে লাগলেন।

———

যদিও দেবসভায় প্রমাণ হয়ে গেল মনসাদেবীর সাপই লক্ষ্মীন্দরকে কামড়েছে, কিন্তু প্রমাণ হলে কি হয়, মনসাদেবী কিছুতেই আর লক্ষ্মীন্দরকে বাঁচাতে রাজি হন না।

বেহুলা কত স্তুতিমিনতি করলেন, কিন্তু পদ্মার আর মন গলে না।

তখন নিরুপায় হয়ে বেহুলা বল্লেন, "দেবতারা সবাই আমার নাচে সন্তুষ্ট হয়ে আমার প্রার্থনা অনুযায়ী বর দেবেন বলে' প্রতিজ্ঞা করেছেন। এখন আমি আমার স্বামীর প্রাণ ভিক্ষা চাচ্ছি। তা' যদি না পাই, তবে সমস্ত দেবতারা সত্য-ভ্রষ্ট হবেন। ত্রিভুবনে তাঁদের অপযশ রটবে।"

বেহুলার কথা শুনে দেবতারা সবাই ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। সত্যিই তো, তাঁরা বেহুলাকে তাঁর ইচ্ছামত বর চাইতে বলেছিলেন, এবং তা' দেবেন বলে' স্বীকারও করেছিলেন। এখন পদ্মাদেবী যে সমস্ত গোলমাল করে' ফেলছেন! তাঁরা সবাই পদ্মাকে ভালো করে' বোঝাতে লাগলেন।

দেবতাদের অনুরোধে পদ্মাদেবী বল্লেন, "বেশ, একটি মাত্র সর্তে আমি লক্ষ্মীন্দরের প্রাণ ফিরিয়ে দেব। যদি বেহুলার শ্বশুর চাঁদ-সওদাগর এখন থেকে আমার পূজা করেন, তবেই আমি লক্ষ্মীন্দরকে বাঁচিয়ে দেব।

চাঁদ আমার সঙ্গে চিরদিন শত্রুতা করেছেন, কেবল শিবের ভক্ত বলে' আমি তাঁর কোন অনিষ্ট করতে পারিনি।"

পদ্মার কথা শুনে বেহুলা অনেকটা ভরসা পেলেন। খুসীতে তাঁর মন ভরে' উঠল। তিনি বল্লেন, "মাগো, আমি তোমাকে নিয়ে চম্পক-নগরে যাব। সেখানে আমার শ্বশুর অবশ্য তোমার পূজা করবেন। যদি তিনি তোমার পূজা না করেন, তবে আমরা আবার তোমার সঙ্গে ফিরে আসব, সেখানে থাকব না।"

সতীর কথা শুনে পদ্মাবতী বল্লেন, "আচ্ছা বেশ, বেহুলার কথা যদি সত্যি হয়, তবে আমি লক্ষ্মীন্দরকে আবার বাঁচিয়ে দেব।"

পদ্মাবতী প্রসন্ন হয়েছেন দেখে দেবতারা সবাই হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। তাঁরা সত্যভঙ্গ হওয়ার দায় থেকে রক্ষা পেলেন, কাজেই তাঁদের আর আনন্দের সীমা-পরিসীমা রইল না।

লক্ষ্মীন্দরের শরীরে শুধ্ কঙ্কাল ছাড়া আর কিছুমাত্র অবশিষ্ট ছিল না।

মনসার আদেশে লক্ষ্মীন্দরের সেই কঙ্কালখানি তাঁর কাছে আনা হোলো। পদ্মাদেবী তখন মহামন্ত্র স্মরণ করে' লক্ষ্মীন্দরের কঙ্কালখানির উপর জল ছড়া দিতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে অস্থি জোড়া লাগতে আরম্ভ করল, আর দেখতে দেখতে লক্ষ্মীন্দরের স্বাভাবিক চেহারা ফিরে এলো।

তখন মনসাদেবী যমরাজকে আদেশ করলেন লক্ষ্মীন্দরের প্রাণ ফিরিয়ে দিতে।

পদ্মার আদেশে যমরাজ দূত পাঠিয়ে তৎক্ষণাৎ লক্ষ্মীন্দরের প্রাণ আনিয়ে দিলেন।

● লক্ষ্মীন্দরের জীবন লাভ ●
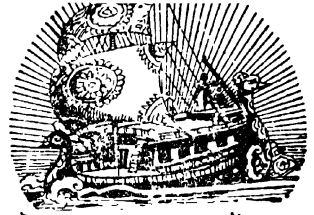
দেখতে দেখতে লক্ষ্মীন্দর বেঁচে উঠলেন। তাঁর পূর্ব্বের রূপ আবার ফিরে এলো। তাঁর সৌন্দর্য দেখে দেবতারা সবাই মুগ্ধ হয়ে গেলেন।

লক্ষ্মীন্দর বেঁচে উঠলেন বটে, কিন্তু তখনো তাঁর দেহে সাপের উগ্র বিষের ঝাঁঝ ছিল। তাই দেখে পদ্মাবতী মহৌষধির জলে লক্ষ্মীন্দরকে স্নান করালেন আর মন্ত্র পড়ে' বিষ ঝাড়তে লাগলেন।

মনসার মন্ত্র কানে যেতেই লক্ষ্মীন্দরের সমস্ত বিষের জ্বালা দূর হয়ে গেল। তাঁর শরীর হোলো স্নিগ্ধ, মুখের ভাব হোলো প্রশান্ত। তিনি গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে বসলেন। যেন তাঁর ঘুম ভাঙল।

লক্ষ্মীন্দর উঠে পদ্মাবতীর পায়ের ধূলো নিয়ে প্রণাম করলেন, মনসাও তাঁকে কোলে নিয়ে আদর করতে লাগলেন।

এই দৃশ্য দেখে বেহুলার যে কী আনন্দ হোলো তা' আর ভাষায় লেখা যায় না। আনন্দে তাঁর দু'চোখ দিয়ে ঝরঝর করে' জল ঝরতে লাগল।

সমস্ত দেবতারাও যে খুশী হলেন সে কথা আর না বল্লেও চলে। সব চেয়ে বেশী খুশী হলেন মহাদেব। কারণ চাঁদ-সওদাগর হচ্ছেন তাঁর একজন মস্ত বড় ভক্ত।

———

স্থির হোলো বেহুলা-লক্ষ্মীন্দরের সঙ্গে মনসাদেবী চম্পক-নগরে যাবেন

মনসাদেবী প্রতিজ্ঞা করলেন যদি চাঁদ-সওদাগর সত্যি সত্যি ভক্তিভরে তাঁর পূজা করেন, তাঁর সঙ্গে শত্রুতা বর্জন করেন, তবে তিনি চাঁদের ছয় পুত্রকে বাঁচিয়ে দেবেন, লোকজনশুদ্ধ তাঁর চৌদ্দ ডিঙ্গা মধুকর উদ্ধার করে' দেবেন, আর তাঁর সংসারে আবার শান্তি আর আনন্দের বন্যা বইয়ে দেবেন।

বেহুলা বল্লেন, "মাগো, আমি কথা দিচ্ছি আমার শ্বশুরকে দিয়ে তোমার পূজা করাব। তুমি দয়া করে' আমার ছয় ভাসুরকে বাঁচিয়ে দাও, শ্বশুরের সমস্ত সম্পত্তি উদ্ধার করে' দাও।"

বেহুলার কথা বিশ্বাস করে' দেবী পদ্মাবতী বল্লেন, "বেশ, তোমার ছয় ভাসুরের 'অস্থি আমাকে এনে দাও, আমি তাদের জীবন ফিরিয়ে দিচ্ছি। সমুদ্রের তীরে থাকে সরুয়া রাক্ষসী, তোমার ছয় ভাসুরের অস্থি তার ঘরে আছে।"

বেহুলা তখনি যোগাসনে বসে' শূন্যপথে উপস্থিত হলেন সরুয়া

রাক্ষসীর বাড়ী। মনসাদেবীর কৃপা হলে সবই সম্ভব হয়।

রাক্ষসী তখন বাড়ী ছিল না। তার ঘরে ঢুকে বেহুলা তাঁর ছয় ভাসুরের অস্থি দেখতে পেলেন, আর আবার শূন্যপথে অস্থিগুলি নিয়ে হাজির হলেন পদ্মাবতীর কাছে।

পদ্মাবতী অস্থিগুলিকে ভালো করে' ধুয়ে ছয়টি বিছানায় শুইয়ে দিয়ে মন্ত্র পড়তে লাগলেন।

অল্পক্ষণের মধ্যেই চাঁদ-সওদাগরের ছয় পুত্র চোখ মেলে চেয়ে বিছানায় উঠে বসলেন। এই ছয়টি কুমারের নাম—ত্রিলোচন, দিগম্বর, হরিহর, কৃষ্ণদাস, বিষ্ণুদাস আর গদাধর।

পদ্মাবতী তাঁদের নানারকম বসনভূষণ দান করলেন আর আশীর্বাদ করলেন। ছয় ভাই একান্ত ভক্তির সঙ্গে পদ্মাবতীর পায়ে লুটিয়ে পড়ে' প্রণাম করলেন।

লক্ষীন্দরের সঙ্গে তাঁদের পরিচয়ও হয়ে গেল। সাত ভাই মিলে মহানন্দে কোলাকুলি করলেন।

এইবার বেহুলা মনসাদেবীকে বল্লেন, "মাগো, এবার আমরা দেশে ফিরে যাব। বিশাল সমুদ্র আমাদের পাড়ি দিয়ে যেতে হবে। তুমি দয়া করে' আমার শ্বশুরের চৌদ্দখানি ডিঙ্গা আবার মাঝিমাল্লা সমেত উদ্ধার করে' দাও।"

মনসাদেবী তৎক্ষণাৎ বীর হনুমানকে ডেকে সমুদ্র থেকে চাঁদ-সওদাগরের চৌদ্দটি ডিঙ্গা তুলে দিতে আদেশ করলেন।

কিন্তু হনুমান বল্লেন, "সমুদ্রের তলায় এতদিন থাকায় ডিঙ্গাগুলি পচে' গেছে। আমি তুলতে গেলে ওগুলি খণ্ড খণ্ড হয়ে ভেঙে যাবে।"

তখন মনসাদেবীর আদেশে পবনদেব গিয়ে সমুদ্রের তলা থেকে ডিঙ্গাগুলি উদ্ধার করে' নিয়ে এলেন।

ডিঙ্গাগুলির উদ্ধার হোলো। এতদিন সমুদ্রের তলায় থাকায় সেগুলি ভেঙেচুরে গেছিল। আবার লোকজন লেগে গেল সেগুলি মেরামত করবার জন্যে।

সমস্ত ঠিক্‌ঠাক হয়ে যাওয়ার পর ডিঙ্গাগুলি আবার আগের মত সাজান হোলো পদ্মাবতী নানারকম ধনরত্ন দিয়ে নৌকাগুলি ভরে' দিলেন।

এক চাঁদ-সওদাগর ছাড়া পৃথিবীতে মনসাদেবীর আর কোন শত্রু ছিল না। এই চাঁদ যদি এবার প্রকৃতই মনসাদেবীর পূজা আরম্ভ করেন তাহলে ত্রিজগতে পদ্মাবতীর আর কোন শত্রু থাকবে না,—সবাই হবে তাঁর ভক্ত।

বেহুলা যখন চাঁদ-সওদাগরকে দিয়ে তাঁর পূজা করাবার ভার নিয়েছেন তখন আর ভাব্‌না কি ?

আনন্দে মনসাদেবীর অন্তর ভরে' উঠল।

———

চৌদ্দটি ডিঙ্গা প্রস্তুত হবার পর বেহুলা মিনতিভরা স্বরে মনসা-দেবীকে বল্লেন, “মাগো, তোমার কৃপায় আমি আবার প্রায় সমস্তই ফিরে পেলাম। স্বামীকে পেলাম, ছয় ভাসুরকে পেলাম, শ্বশুরের সমস্ত সম্পত্তি আর তাঁর চৌদ্দটি ডিঙ্গা পর্যন্ত লাভ করলাম। এইবার মা, আমার আর একটি অনুরোধ আছে। ধন্বন্তরীর মত বৈদ্য আর ত্রিভুবনে নেই। তাঁকে মা কৃপা করে’ আবার বাঁচিয়ে দাও। তারপর তোমাকে নিয়ে আমরা চম্পক-নগরে রওয়না হব, আর তোমার পূজা করব।”

বেহুলার অনুরোধে মনসাদেবী ধন্বন্তরীর জীবনও ফিরিয়ে দিলেন।

তারপর বেহুলা, লক্ষ্মীন্দর আর তাঁর ছয় ভাই সকলে দেবতাদের প্রণাম করে’ তাঁদের আশীর্বাদ লাভ করে’ নৌকায় এসে উঠলেন। সঙ্গে তাঁদের চল্লেন মনসাদেবী আর নেতা।

বেহুলার মনে আর আনন্দ ধরে না, তাঁর মনের সাধ পূর্ণ হয়েছে, তাঁর সত্য রক্ষা হয়েছে। মৃত স্বামীকে ফিরে পেয়েছেন, ভাসুর ছয় জনকে বাঁচাতে পেরেছেন, তার উপর আবার শ্বশুরের সমস্ত নষ্ট-সম্পত্তি উদ্ধার করতে পেরেছেন। সকলকে নিয়ে চলেছেন শ্বশুরের দেশে। আর সব থেকে বেশী আনন্দের কথা, স্বয়ং পদ্মাবতী চলেছেন তাঁদের সঙ্গে।

সবাই মিলে ডিঙ্গার উপর এক সিংহাসনে পদ্মাদেবীকে বসালেন—বেহুলা নিজের হাতে তাঁকে বাতাস করতে লাগলেন অন্যান্য সবাই হাত জোড় করে' তাঁর কাছে দাঁড়িয়ে রইল। নেতা পাশে বসে' পান জোগাতে লাগলেন।

লক্ষ্মীন্দর এইবার মাঝিদের ডিঙ্গা ছাড়তে হুকুম দিলেন। তাঁর আজ্ঞা পেয়ে মাঝিরা ডঙ্কা বাজিয়ে ডিঙ্গা ছেড়ে দিল। ডিঙ্গা ভেসে চল্ল অনুকূল বাতাসে শোঁ শোঁ করে' ভরাপালে।

সাত দিন সাত রাত পর ডিঙ্গা এসে ভিড়ল সেই অপ্সরীদের ঘাটে।

বেহুলা লক্ষ্মীন্দরকে বল্লেন, "তোমাকে নিয়ে ভেলায় ভাসতে ভাসতে আমি এই ঘাটে এসে মনসাদেবীর ব্রত করি।"

সে কথা শুনে লক্ষ্মীন্দরও তীরে উঠে ধুমধাম করে' পদ্মার পূজা করলেন।

তারপর তাঁরা হাজির হলেন ধনা-মনার দেশে।

ডিঙ্গার লোকজনের কোলাহল শুনে ছুটে এলো দুই দানব—ধনা আর মনা। বেহুলাকে দেখেই তারা চিনতে পারলো। এই মেয়েটাই সেদিন তাদের ফাঁকি দিয়ে পালিয়েছিল। তারা তো রেগেই অস্থির! এর জন্যে গতবার তাদের কী নাকালই না হতে হয়েছে! তারা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তেড়ে এলো ডিঙ্গার দিকে।

মনসাদেবী বল্লেন, "ওহে লক্ষ্মীন্দর, ধনা আর মনা দুই ভাই অত্যন্ত অত্যাচারী দানব। বড় ভয়ংকর জীব এরা। বহু লোককে এরা মেরে শেষ করেছে, আর অনেক বণিকের বাণিজ্য-সম্পদ্ এরা লুটপাট করে'

নিয়েছে। তুমি এই দুই ভাইকে বধ কর। আমার আশীর্বাদে তুমি জয়ী হবে। তোমার কোনো ভয় নেই।"

মনসাদেবীর কথায় সাহস পেয়ে লক্ষ্মীন্দর তৎক্ষণাৎ ডাঙায় নেমে দুই দানবকে আক্রমণ করলেন।

তখন বাধল তুমুল যুদ্ধ। কিন্তু স্বয়ং পদ্মাদেবী হচ্ছেন লক্ষ্মীন্দরদের পক্ষে, কার সাধ্য তাঁদের হারায়! কিছুক্ষণ যুদ্ধের পরই ধনা-মনা মারা পড়ল। আবার সবাই ডিঙ্গা ভাসালেন সমুদ্রের জলে।

এইবার তাঁদের ডিঙ্গা উপস্থিত হলো সেই গোদাদের দেশে। সাত-ভাই গোদা বেহুলার অভিশাপে জলের মধ্যে বন্দী হয়ে ছিল।

এইবার বেহুলা তাদের মুক্তি দিয়ে দিলেন। শুধু তাই নয়, তাঁর পূর্বের প্রতিশ্রুতি মত সাতটি উপযুক্ত ক'নে ঠিক করে' তাদের বিয়ে দিয়ে দিলেন।

গোদারা সন্তুষ্ট হয়ে ক'নে নিয়ে বাড়ী চলে' গেল। তাদের মুখে হাসি আর ধরে না!

এইভাবে আরো কিছুদিন জলে ভাসবার পর ডিঙ্গাগুলি চম্পক-নগরের ধর্মঘাটে এসে উপস্থিত হোলো।

এতদিন পর সবাই আবার দেশে ফিরে এসেছেন বলে' মনে তাঁদের আর আনন্দ ধরে না!

———

ডুম্‌নীর বেশে বেহুলা

ঘাটে ডিঙ্গা লাগিয়ে লক্ষ্মীন্দর বেহুলাকে বল্লেন, "এস এক কাজ করা যাক্। আমাদের ঠিক এইভাবে বাড়ী যাওয়া উচিত হবে না। তুমি এক কাজ কর, কিছু জিনিসপত্তর সঙ্গে নিয়ে ডুম্‌নীর বেশে চম্পক-নগরে যাও। সেখানে গিয়ে ছদ্মবেশে বাড়ী বাড়ী জিনিস ফেরি করতে করতে আমাদের বাড়ী হাজির হও। বাড়ীর হালচাল জেনে ফিরে এসে আমাদের খবর দিলে, আমরা সবাই মিলে বাড়ী গিয়ে বাবা-মায়ের পায়ের ধুলো গ্রহণ করব।"

বেহুলা তখন চট্‌পট্ অতি নিপুণভাবে ডুম্‌নীর ছদ্মবেশ ধারণ করলেন। সঙ্গে নিলেন কুলো-ডালা-ঝুড়ি-পাখা ইত্যাদি অনেক রকম ফেরির জিনিস, তারপর বাড়ী বাড়ী সেই সব জিনিস ফেরি করতে করতে সটান হাজির হলেন নিজের শ্বশুরবাড়ীতে।

সনুকা ডুম্‌নীর রূপ দেখে চমকে উঠলেন। তিনি দেখলেন এই ডুম্‌নীর চেহারাটা যেন অবিকল তাঁর পুত্রবধূ বেহুলার মত।

তিনি ছদ্মবেশিনী বেহুলাকে তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। বেহুলা নিজের পরিচয় গোপন করে' মিথ্যা পরিচয় দিলেন। কিন্তু সনুকা তাঁর আকারপ্রকার

দুঃখ করে' সুনুকা বল্লেন, "লক্ষণ দেখে আমি বুঝতে পারছি তুমি আমার পুত্রবধূ বেহুলা, এ ছাড়া তুমি আর অন্য কেউ নও। আমার প্রিয়ধন লক্ষীন্দরকে তুমি কোথায় ফেলে এলে? আমাদের কুলে কালি দিয়ে তুমি শেষে কিনা ডোমের ঘরে বাস করছ! হায় হায়, লোক জিজ্ঞাসা করলে আমি তাদের কি উত্তর দেব? শেষকালে তুমি আমাদের নাম ডোবালে? তার চেয়ে জলে ডুবে মরলে না কেন? তা হলে, আপদ চুকে যেত।"

শাশুড়ীর কাতরতা দেখে এইবার বেহুলা সত্যি সত্যি তাঁর নিজের পরিচয় দিলেন।

তারপর মৃত-স্বামীকে নিয়ে ভেলায় ভাসবার পর থেকে যে সব ঘটনা ঘটেছিল, আগাগোড়া তাঁকে খুলে বল্লেন। শেষে বল্লেন, "মাগো, আমরা সবাই এসে চম্পক-নগরের ধর্মঘাটে অপেক্ষা করছি। সঙ্গে আছেন আমাদের দেবী পদ্মাবতী। তাঁর কৃপাতে আমরা ধনজন সব ফিরে পেয়েছি। লক্ষ বলি দিয়ে তাঁর পূজা না করলে এ সবই বৃথা হবে। আমাদের সকলকে আবার হারাতে হবে। আমার সঙ্গে আপনার সাত-পুত্র এসেছে, তারা সবাই আবার ফিরে যাবে,—আবার কেঁদে কেঁদে আপনার দিন কাটাতে হবে। মনসাদেবীর পূজা করলে আবার আপনারা সবাই সুখে শান্তিতে বাস করবেন, সমস্ত অমঙ্গল দূর হবে।"

বেহুলার সঙ্গে ছিল অতি সুন্দর চিত্র-বিচিত্র-করা এক পাখা। এই পাখায় আঁকা ছিল পদ্মাবতীর ছবি। বেহুলা সেই পাখাখানা লোক দিয়ে চাঁদ-সওদাগরের কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

এমন সুন্দর পাখা চাঁদ আর জীবনে কখনো দেখেননি, তিনি

পাখাখানা হাতে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছেন, হঠাৎ তাঁর নজরে পড়ল মনসা-দেবীর ছবি। আর যায় কোথায়, তিনি ঘৃণায় পাখাখানা মাটিতে ছুঁড়ে ফেল্লেন, তারপর হেমতালের লাঠি হাতে ছুটে এলেন অন্দরমহলে ভীষণ চিৎকার করতে করতে।

চাঁদ-সওদাগরের গর্জন বেহুলার কানে যেতেই তিনি ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি খিড়কীর দরজা দিয়ে সোজা পালিয়ে এলেন ধর্মঘাটে, তারপর মনসার পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে সমস্ত কথা খুলে বল্লেন।

বেহুলার কথা শুনে লক্ষ্মীন্দর মাঝিদের দলপতি ডুলাই কাণ্ডারীকে ডেকে বল্লেন, "ওহে ডুলাই কাণ্ডারী, তুমি অবিলম্বে আমার বাবার কাছে যাও। তাঁর কাছে কোনো কথা গোপন না রেখে সমস্ত খুলে বলবে। তাঁকে বিশেষভাবে জানিয়ে দেবে—যদি তিনি মনসাদেবীর পূজা করেন তবে ধন-পুত্র-পরিজন সবই আবার ফিরে পাবেন। আর তা না করলে আবার আমাদের সবাইকে হারাতে হবে।—তুমি শীগ্‌গির যাও আর তাঁর মতামত জেনে এসে আমাদের খবর দাও।"

———

চাঁদ-সওদাগর সভায় বসে' আছেন, চারিধারে ঘিরে আছে পাত্র-মিত্র-সভাসদের দল, এমন সময় দুলাই কাণ্ডারী এসে চাঁদকে জোড়হাতে নমস্কার করে' দাঁড়াল।

বেহুলা আবার সকলকে নিয়ে ফিরে এসেছেন, চাঁদ-সওদাগর এ কথা শুনেছিলেন। বেহুলার সঙ্গে যে মনসাদেবীও এসেছেন, এ কথা জানতেও তাঁর বাকী ছিল না। এই জন্যে মনে মনে তিনি বেহুলার উপর যে খুবই চটে' ছিলেন, সে কথা বোধ হয় আর না বল্লেও চলে।

সভায় এসে দুলাই কাণ্ডারী অতি বিনীতভাবে বলতে লাগল, "মহারাজ, আপনার সমস্ত পুত্রেরা আবার জীবিত হয়ে ফিরে এসেছেন। আপনার সমস্ত নষ্ট-সম্পত্তির উদ্ধার হয়েছে। কোনো ক্ষতিই আপনার হয়নি। স্বয়ং পদ্মাবতী আপনার সর্বস্ব ফিরিয়ে নিয়ে এসেছেন। যদি এক লক্ষ বলি দিয়ে তাঁর পূজা না করেন, তবে আবার সবই হারাতে হবে।"

মাঝির কথা শুনে চাঁদ-সওদাগর কোন উত্তর দিলেন না, অতি বিরক্তির সঙ্গে মুখ ফিরিয়ে বসে' রইলেন।

সভায় উপস্থিত ছিলেন শ্রীধর পণ্ডিত। তিনি তখন চাঁদকে বল্লেন, "বাছা, তোমার মৃত-পুত্রেরা সবাই আবার বেঁচে ঘরে ফিরে এসেছে। তুমি ধন-পুত্র-পরিজন সমস্তই হারিয়েছিলে, তোমার দুর্দশা চরমে এসে পৌঁচেছিল, এখন মা-মনসাদেবীর কৃপায় আবার সব ফিরে এসেছে। মা-মনসা অতি দয়াবতী। তুমি তাঁর সঙ্গে যথেষ্ট খারাপ ব্যবহার করেছ, তবুও দেখ, কত তাঁর দয়া! তুমি রাগ, অভিমান বিসর্জন দিয়ে এখন থেকে পদ্মাবতীর পূজা আরম্ভ কর, তোমার মঙ্গল হবে। স্বর্গের দেবীর সঙ্গে কি আর পৃথিবীর মানুষের ঝগড়া পোষায়!"

শ্রীধর পণ্ডিতের কথা শুনে চাঁদ-সওদাগর ঠাট্টার সুরে বল্লেন, "গুরুদেব, আপনি নিজেদের স্বার্থের জন্যে এই কথা বলছেন। মনসার পূজা করলে, আপনারা দক্ষিণা পাবেন, নৈবেদ্য পাবেন, তাই আপনাদের এত উৎসাহ!"

সভায় উপস্থিত ছিলেন চাঁদ-সওদাগরের খুড়া যশোধর। তাঁর বয়স হয়েছিল অনেক। তিনি চাঁদের কথা শুনে রাগে থর্ থর্ করে' কাঁপতে লাগলেন।

তিনি তিরস্কার করে' চাঁদকে বল্লেন, "ওহে চাঁদ, তোমার বড় আস্পর্ধা বেড়েছে দেখছি, তুমি সভায় সকলের সামনে গুরুকে এইভাবে অপমান করলে! সংসারের মধ্যে ে আর ব্রাহ্মণ হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ। তুমি সেই ব্রাহ্মণকে অপদস্থ করলে! বুঝতে পেরেছি, তোমার সর্বনাশ ঘনিয়ে এসেছে। মরবার জন্যেই পিঁপড়ের ডানা গজায়। তোমারও তাই হয়েছে। সমস্ত মানুষের মধ্যে তুমি সব বিষয়ে ছিলে ইন্দ্রের সমান। দেবতাকে হিংসা করে' তোমার আজ এই দশা হয়েছে। লঙ্কায় বাণিজ্যে গিয়ে তুমি অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়েছিলে। কিন্তু মনসার সঙ্গে ঝগড়া করে' তুমি সমস্ত হারালে।

অমন চাঁদের মত ছেলেদেরও রাখতে পারলে না। তোমার রাজ্যে এখন কেবল দুঃখ আর অশান্তি। চারিদিকেই খালি শোকের ছায়া। আবার মনসাদেবীর কৃপায় তুমি সবই ফিরে পাচ্ছ। কিন্তু তুমি এমনই নির্বোধ যে, এখনো পদ্মাদেবীর প্রতি তোমার ভক্তি হচ্ছে না! যদি ভালো চাও, তবে দুষ্টবুদ্ধি ছেড়ে দিয়ে এখনি পদ্মাদেবীর কাছে গিয়ে ক্ষমা ভিক্ষা কর। তাঁর পূজার আয়োজন কর। আমার আদেশ যদি পালন না কর, তবে সমস্ত প্রজারা তোমার বিদ্রোহী হয়ে উঠবে, তোমাকে দেশছাড়া করে' ছাড়বে। তোমাকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে প্রজারা লক্ষ্মীন্দরকে রাজা করবে। ঘরে ঘরে সবাই ভক্তির সঙ্গে মনসার পূজা করবে।"

রাগে গজ্‌গজ্‌ করতে করতে চাঁদের বৃদ্ধ খুড়ামহাশয় যখন এই কথা-গুলি বল্লেন, তখন সভার সমস্ত লোক তাঁর কথায় সায় দিয়ে উঠল। কেউ কেউ আবার প্রকাশ্যেই বিদ্রোহ ঘোষণা করল।

ব্যাপার দেখে ভয়ে চাঁদ-সওদাগরের মুখ শুকিয়ে গেল। তিনি মুখ নীচু করে' বসে' রইলেন। একটা কথাও তাঁর মুখ দিয়ে বের হোলো না।

স্নুকা দেবী অন্তঃপুর ছেড়ে দাসীদের নিয়ে সভায় হাজির হলেন আর চাঁদের পায়ে ধরে' মিনতি করতে লাগলেন,—"প্রভু সমস্ত রাগ-অভিমান ছেড়ে দিয়ে মনসাদেবীর পূজো দিন। দেখুন আমরা আবার সব ফিরে পেয়েছি। আমাদের হারা-পুত্রেরা আবার ফিরে এসেছে। আপনি আপনার গোঁ ছেড়ে দিয়ে মনসাদেবীর কাছে ক্ষমা চান্‌।"

তখন চাঁদ-সওদাগর বল্লেন, "আমার প্রতি দেখছি সকলেই বিরক্ত হয়ে উঠেছে। বিশেষতঃ পরম শ্রদ্ধাভাজন খুড়ামহাশয় পর্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছেন।

হে সভাসদেরা, তোমরা শোনো, সকলেরই যদি পদ্মাদেবীকে পূজা করতে ইচ্ছা হয়ে থাকে, তবে আমাকে নিয়ে চল তাঁর কাছে।”

চাঁদের এই কথা শুনে সভার সকলে আনন্দে জয়ধ্বনি করে’ উঠল। সুনুকা দেবীর মুখে আবার হাসি ফুটে উঠল। একে একে কত কথাই তাঁর মনে পড়তে লাগল। তাঁর সুখের সংসারের কথা, অতুল ঐশ্বর্যের কথা—তাঁর চাঁদ-পারা সাত সাতটি ছেলের কথা, রূপে-গুণে অদ্বিতীয়া পুত্রবধূ বেহুলার কথা।

সকলকেই তিনি হারিয়েছিলেন মনসাদেবীর রাগের জন্যে। এবার মনসাদেবীকে তুষ্ট করে’ আবার সব ফিরিয়ে পাবেন।

চাঁদ-সওদাগরের মন যে এত সহজেই ফিরে যাবে, তা আগে কেউ ভাবতে পারেনি। এখন চাঁদের কথা শুনে চম্পক-নগরের সকলেই যেন আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠল। কারণ এতদিন কেউ সাহস করে প্রকাশ্যে মনসা-দেবীর পূজো করতে পারেনি। এবার প্রাণ ভরে’ তাঁর পূজো করে’ মনের সাধ মেটাবে।

———

চতুর্দোলায় চড়ে' অতি ধুমধামের সঙ্গে চাঁদ-সওদাগর এসে উপস্থিত হলেন ধর্মঘাটে। তাঁর সঙ্গে এলেন সুনুকা দেবী আর পুত্রবধূর দল। লোক-লস্কর সৈন্যসামন্ত সবাই এলো মিছিল করে'। বাদ্যকরের দল নানারকম বাজনা বাজিয়ে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে তুল্ল।

সবাইকে ঘাটে আসতে দেখে মনসাদেবী উৎফুল্ল হয়ে লক্ষ্মীন্দরকে বল্লেন, "তোমরা শীগ্‌গির তীরে উঠে বাবার সঙ্গে দেখা কর।"

মনসাদেবীর কথামত সাত-ভাই-বেহুলাকে সঙ্গে নিয়ে চাঁদের সঙ্গে দেখা করে' তাঁর পায়ের ধূলো নিলেন।

অনেকদিন পর ছেলেদের দেখে-চাঁদ-সওদাগরের চোখ দিয়ে আনন্দাশ্রু ঝরতে লাগল। ছেলেদের অপূর্ব সৌন্দর্য দেখে তাঁর চোখ যেন ধাঁধিয়ে উঠল। তিনি অন্ধ-আবেগে ছেলেদের বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

তারপর লক্ষ্মীন্দর সমস্ত ঘটনা একটি একটি করে' চাঁদ-সওদাগরকে বল্লেন, কোন কথাই আর গোপন রাখলেন না। তারপর বল্লেন, "বাবা, তোমার মত ভাগ্যবান্ আর ত্রিভুবনে কে আছে! তোমার মৃত-পুত্র, হারাধন আবার সমস্তই ফিরে এসেছে। এ রকম অসম্ভব কথা কোথাও শোনা যায়

না। কিন্তু মনসাদেবীর পূজা যদি চম্পক-নগরে না হয় তবে আবার সমস্তই হারাতে হবে।”

লক্ষ্মীন্দরের কথা শুনে চাঁদ-সওদাগর তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে’ কাঁদতে লাগলেন। এতদিন পুত্রদের অভাবে তিনি কী কষ্টই না সহ্য করেছেন, দুঃখে তাঁর বুক ভেঙে গেছে। বিধবা পুত্রবধূদের দুরবস্থা আর যন্ত্রণা দেখে তিনি এতদিন মরমে মরেছিলেন। হায় হায়, এতদিন মনসাদেবীকে অবজ্ঞা করে’ তিনি কী মারাত্মক ভুলই না করেছেন! পরম দয়াময়ী পদ্মাবতী আবার তার ধনজন সব ফিরিয়ে দিয়েছেন, তার উপর কত কৃপা করেছেন! আর তিনি তাঁর পূজা করবেন না? তাঁকে মানবেন না?

চাঁদ-সওদাগর ভক্তিগদগদস্বরে বল্লেন, “এবার থেকে মনসাদেবীর পূজা ছাড়া আমার আর কোন কাজ নেই। দৃঢ়-ভক্তি নিয়ে আমি মা-মনসার পূজা করব। মা যেন আমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করেন।”

এই কথা শুনে সেখানে আনন্দ-কোলাহল সুরু হোল। শ্রীধর পণ্ডিত, চাঁদের বৃদ্ধ খুড়া যশোধর সবাই আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠলেন। আর সুনুকা দেবীর তো কথাই নেই, আনন্দে তাঁর মুখ দিয়ে আর কোন শব্দই বের হতে চাইল না।

তিনি বেহুলাকে কোলে করে’ তাঁর চাঁদমুখে শত শত চুমু খেতে লাগলেন। তাঁর অন্যান্য পুত্রবধূরা তাঁদের মৃত-স্বামীদের ফিরে পেয়ে যেন হাতে স্বর্গ লাভ করলেন। এ যে তাঁদের কল্পনার অতীত ছিল, তাঁদের স্বপ্নেরও বাইরে ছিল!

তখন চাঁদ-সওদাগর সবাইকে নিয়ে পদ্মাবতীর কাছে ডিঙ্গায় এসে হাজির হলেন। হাতে ছিল তাঁর হেমতালের লাঠিখানা। এই লাঠিকে মনসাদেবী বড়ই ভয় করতেন।

দূর থেকে এই লাঠিখানা দেখে পদ্মাবতী তো ভয়েই অস্থির। কিন্তু নেতা তাঁকে অভয় দিলেন। আর বাস্তবিকই মনসাদেবীর ভয় কাটল, যখন চাঁদ-সওদাগর এসে তাঁর সামনে যুক্তকরে ভক্তিভরে দাঁড়ালেন।

হাত জোড় করে' চাঁদ বল্লেন পদ্মাবতীকে, "হে মা-মনসা, তুমি আমায় ক্ষমা কর। তোমার সঙ্গে আমি অনেক অসৎ ব্যবহার করেছি, তোমাকে অনেক অপমান করেছি, অনেক মন্দ বলেছি, আমাকে তুমি কৃপা কর, আমার অপরাধ মার্জনা কর। তোমার দয়ায় আবার আমি সব ফিরে পেয়েছি। বুঝেছি তুমি প্রত্যক্ষ দেবতা। মা, আমি তোমার পূজো করবো, কিন্তু সে পূজো করবো বাম-হাত দিয়ে। কারণ তুমি অস্থানে কুস্থানে ঘুরে বেড়াও, যেখানে সেখানে পূজো খেয়ে বেড়াও। আমি কুলীন, তোমার পূজো করলে আমার অপযশ রটবে চারিধারে। আমার বাম-হাতের পূজোতেই তোমায় সন্তুষ্ট হতে হবে।"

এই কথা শোনামাত্র মনসাদেবী অতিমাত্রায় ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। তাঁর সমস্ত শরীর থর্‌থর্‌ করে' কাঁপতে লাগল, তাঁর মুখ দিয়ে ধক্‌ধক্‌ করে' আগুন বের হতে লাগল।

মনসার এই মূর্তি দেখে সকলেই ভয় পেয়ে গেল। চাঁদের উপর সবাই বিরক্ত হয়ে উঠল।

মনসাদেবীর সে কী রাগ! তিনি এমনি হুঙ্কার ছাড়লেন যে সেই শব্দে সকলে কেঁপে অস্থির।

চাঁদ-সওদাগর সেই ভীষণ শব্দ শুনে হতবুদ্ধি হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। স্নুকা দেবীরও ভয়ে প্রাণ উড়ে গেছে।

তিনি কাঁদতে কাঁদতে মনসাদেবীর পায়ে লুটিয়ে পড়ে' বার বার ক্ষমা চাইতে লাগলেন। তিনি বল্লেন, "মাগো, দয়া করে' তুমি ক্রোধ সম্বরণ কর। অকালে প্রলয় এনো না, মা। চাঁদ-সওদাগর কুবুদ্ধির বশে তোমার সঙ্গে বাদ করছেন, তুমি নিজগুণে তাঁকে ক্ষমা কর, মা। তুমি অনন্ত দয়াবতী, পরম করুণাময়ী, তুমি তোমার ক্রোধ থামাও। এ সংসারে যা কিছু আছে, সে সবই তোমার বিভূতি। তুমি মা ইচ্ছাময়ী, তোমার ইচ্ছায় সব হয়।"

এই রকম নানাভাবে স্নুকা পদ্মাবতীর স্তব করতে লাগলেন। তাঁর স্তব শুনে পদ্মা শান্ত হলেন, আবার সৌম্যমূর্তি ধারণ করলেন।

তিনি স্নুকাকে বল্লেন, "শোনো স্নুকা, তোমার অনুরোধে আমি ক্রোধ সম্বরণ করলাম। আমি শেষবারের মত বলছি যদি চাঁদ-সওদাগর আমার সেবক হয়ে থাকে, তবে আমি তোমাদের ক্ষমা করব। তা না
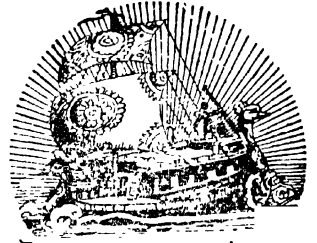
আমি সকলকে সংহার করব। আমাকে কেউ আর থামাতে পারবে না। তোমরা কেউ আর আমার দেখা পাবে না। আমি চাঁদের অনেক অপমান সহ্য করেছি। আর কিছুতেই তাকে ক্ষমা করব না। সকলেরই সহ্যের একটা সীমা আছে।”

পদ্মাবতীকে আবার শান্ত হতে দেখে চাঁদ-সওদাগর ধুলো ঝেড়ে উঠলেন, আর হাত জোড় করে' ভক্তিভরে বল্লেন, “মাগো, আমি তোমার শরণাগত, তুমি আমায় ক্ষমা কর, মা! তোমার কৃপায় আমি আমার সমস্ত সম্পদ্ ফিরে পেয়েছি, আমার মৃত-পুত্রদের মুখ আবার দেখতে পেয়েছি। মাগো, আমি প্রতিজ্ঞা করছি, এবার থেকে ভক্তির সঙ্গে তোমার পূজো করব। তুমি তুষ্ট হও মা! ডান-হাত দিয়েই তোমার পূজো করব। তুমি যাতে তুষ্ট হও—তাই করব মা। আমি অতি মূর্খ বলে' এতদিন তোমার সঙ্গে ঝগড়া করেছি, তোমার মহিমা বুঝতে পারিনি।”

চাঁদের কথা শুনে পদ্মাবতী তুষ্ট হলেন। তিনি হাসিভরা মুখে বল্লেন, “যদি এক লক্ষ বলি দিয়ে আমার পূজো কর তবে আমি তোমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করব।”

চাঁদ-সওদাগর বল্লেন, “লক্ষ বলি দিয়ে পূজো করে গরীব লোকে, আমি তোমাকে নয় লক্ষ বলি দিয়ে পূজো করব।” এই বলে' চাঁদ-সওদাগর দেবী-পদ্মাবতীর চরণে লুটিয়ে পড়ে' নিজের পূর্ব অপরাধের জন্যে বার বার ক্ষমা চাইতে লাগলেন।

পদ্মাবতী চাঁদের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করে' তাঁকে হাত ধরে' টেনে তুল্লেন, আর আশীর্বাদ করলেন। মনসার সঙ্গে চাঁদ-সওদাগরের বিবাদ-ভঞ্জন হোলো দেখে সকল লোকে আনন্দে অধীর হয়ে জয়ধ্বনি করে' উঠল।

লক্ষ্মীন্দর বল্লেন, "বাবা, তুমি এতদিনে যথার্থ একটা কাজের মত কাজ করলে। তোমার যশ দেশবিদেশে ছড়িয়ে যাবে। ত্রিভুবনের সকলে তোমার প্রশংসা করবে।"

তখন পদ্মা বল্লেন, "বাছা চাঁদ, তুমি এখন আমাকে নিয়ে ঘরে চল। এখন থেকে তুমি পরম সুখে ধনপুত্র নিয়ে রাজ্যচালনা করবে। তোমার আর কোনো বিপদ্ হবে না। আমি সর্বদাই তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকব।"

তারপর আর কি। চাঁদ-সওদাগর মহাধুমধামে মনসার নামে জয়ডঙ্কা বাজিয়ে তাঁকে নিয়ে ডিঙ্গায় করে' বাড়ী চল্লেন। সঙ্গে চল্ল চাঁদ-সওদাগরের লোকলস্কর পাইক-বরকন্দাজ। সকলের মন আনন্দে ভরপূর।

তাদের উচ্ছ্বাসধ্বনিতে দিগ্‌দিগন্ত মুখরিত হয়ে উঠল। মনসাদেবীর জয়ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল।

চম্পক-নগর সুদ্ধ লোক ঘন-ঘন চিৎকার করতে লাগল—"জয় মা মনসা-দেবীর জয়, জয় দেবী পদ্মাবতীর জয়, জয় ভগবতী বিষহরির জয়!"

পদ্মাবতীর প্রিয় সহচরী নেতারও আজ আর মনে আনন্দ ধরে না।

চাঁদ-সওদাগরের মতের পরিবর্তন দেখে তিনিও অবাক্ হয়ে গেছিলেন,—তিনি শতমুখে তাঁর প্রশংসা করতে লাগলেন।

———

চাঁদের মনসা পূজা

চাঁদ-সওদাগর মনসাদেবীর পূজো করবেন, রাজ্য জুড়ে হুলুস্থুল পড়ে' গেল। চাঁদ-সওদাগরের জয়ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস ভরে' উঠল, ঘরে ঘরে সুরু হোলো আনন্দ-উৎসব।

নিমন্ত্রণ পেয়ে নানা দেশ থেকে চাঁদের আত্মীয়স্বজন জ্ঞাতিকুটুম্ব বন্ধু-বান্ধব সবাই এসে হাজির হলেন। পূজোর সমস্ত জিনিসপত্র জোগাড় করা হোলো। বলির পশু সংগ্রহ করা হোলো। সমস্ত দেশ জুড়ে সকলের মুখে এই উৎসবের কথা।

যেখানে যত ভালো ভালো বাদ্যকর ছিল, তাদের ডেকে আনা হোলো। তাদের মধুর বাজনার শব্দে দশদিক্ যেন মেতে উঠল।

তারপর আরম্ভ হোলো পদ্মাদেবীর পূজো।

সন্ধ্যাবেলা চাঁদ-সওদাগরের কুলপুরোহিত শ্রীধর পণ্ডিত শুদ্ধ জলে স্নান সেরে পূজোয় বসলেন।

পূজোর মণ্ডপে চাঁদ-সওদাগর ছেলেদের নিয়ে হাজির হলেন। অগুরু, চন্দন আর ধূপের গন্ধে চারিদিক্ ভরে' উঠল। পূজোর সভা নানারকম আলোর

লোক যে সেই পূজো দেখতে এলো তার আর সীমা-সংখ্যা নেই।

এইরূপে মহাধুমধামে ষোড়শোপচারে পদ্মাদেবীর পূজো সাঙ্গ হোলো। তারপর সকলে ভক্তিভরে পদ্মা-দেবীকে প্রণাম করিলেন।

সমস্ত রাত ধরে' চল্ল পদ্মার নামকীর্তন। ভোরবেলা, অতি প্রত্যূষে রাশি রাশি নৈবেদ্য সাজানো হোলো। পুরবাসীরা দলে দলে নানারকম মিঠাই-মণ্ডা ফল-ফুল এনে জড় করতে লাগল দেবীর পূজোর জন্যে।

মহা আড়ম্বরে ঢাক ঢোল বাঁশি কাঁসি বেজে পূজোর মণ্ডপকে জমজমাট করে' তুল্ল। বলির সমস্ত পশুও সংগ্রহ করে' নিয়ে আসা হোলো।

চাঁদ-সওদাগর দেবীকে সন্তুষ্ট করবার জন্যে নিজহাতে খড়্গ নিয়ে পশু বলি দিতে আরম্ভ করলেন। প্রতিদিন তিনি এক লক্ষ করে' পশু বলি দিতে লাগলেন। এই রকম ভাবে নয় দিনে তিনি নয় লক্ষ পশু বলি দিলেন। এই নয় দিন ধরেই মনসাদেবীর পূজো চল্ল।

এই ভাবে নয় দিনের দিন পদ্মাদেবীর পূজো শেষ হোলো।

পূজোর শেষে চাঁদ-সওদাগর মনসাদেবীকে প্রণাম করে' তাঁর স্তব করতে লাগলেন ঃ "মাগো মনসা, সংসারে তোমা ছাড়া আমার আর অন্য গতি নেই। তুমি শিবের কন্যা। তুমি অসীম দয়াবতী। তুমি আমার ধন-জন-পুত্র সমস্তই আবার ফিরিয়ে দিয়েছ। মাগো, আমি তোমার সেবক। তুমি আমার অতীতের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা কর, মা! তুমি ছাড়া এ সংসারে আমার দরদী আর কেউ নেই। তোমার পায়ে আমি মন-প্রাণ সমর্পণ করলাম।"

চাঁদ-সওদাগরের স্তবে তুষ্ট হয়ে পদ্মাদেবী তাঁকে আশীর্বাদ করে'

বল্লেন, “বাছা চাঁদ-সওদাগর, আমি তোমার উপর বড়ই সন্তুষ্ট হয়েছি। আমি তোমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করেছি। তোমার জয় হোক !”

চাঁদ-সওদাগর তখন রাজ্যের সকল স্থানে সকলকে পদ্মাদেবীর পূজো করতে আদেশ দিলেন, তারপর মনসাদেবীর আদেশে সকলকে ধন বিতরণ করলেন। ব্রাহ্মণ, দৈবজ্ঞ, ভট্ট, অন্ধ, খঞ্জ প্রভৃতি সবাই প্রচুর অর্থ পেয়ে খুসী হয়ে চাঁদকে দু’ হাত তুলে আশীর্বাদ করতে করতে বাড়ী চলে’ গেল।

এই ভাবে পূজো সাঙ্গ হলে পদ্মাদেবী খুসী হয়ে নেতাকে নিয়ে হংসরথে চড়ে’ স্বর্গের দিকে চল্লেন।

পদ্মাবতীর পূজোর আড়ম্বর দেখে নেতাও খুব খুসী হয়েছিলেন। তিনি বল্লেন, “সই, সত্যি আজ আমার বড়ই আনন্দ হচ্ছে। চন্দ্রধর যে রকম ভাবে তোমার পূজো করলেন, এ রকম বড় একটা শোনা যায় না।”

পদ্মাবতী বল্লেন, “সত্যিই তাই। আগে চাঁদের উপর যেমন রুষ্ট হয়েছিলাম এখন তেমনি আবার তার উপর তুষ্ট হয়ে স্বর্গে ফিরে যাচ্ছি।”

বেহুলার পরীক্ষা

মনসাদেবীর সঙ্গে চাঁদ-সওদাগরের বিবাদ-ভঞ্জন হোলো, এতদিনের শত্রুতার অবসান হোলো। চম্পক-নগরের প্রজারা যেন সবাই হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। রাজ্যে আবার ফিরে এলো সুখশান্তি আর আনন্দ।

কিন্তু চাঁদ-সওদাগরের বাড়ীতে আবার একটু অশান্তির সৃষ্টি হোলো। লক্ষ্মীন্দর সুনুকাকে বল্লেন, "মা, এইবার একবার বেহুলাকে পরীক্ষা করা দরকার।"

লক্ষ্মীন্দরের কথা শুনে সুনুকা দেবী তো অবাক্। চাঁদ-সওদাগর বল্লেন, "পরীক্ষা আবার কিসের ?"

লক্ষ্মীন্দর বল্লেন, "বেহুলা এতদিন তোমাদের ছেড়ে নানা জায়গায় নানা অবস্থার মধ্য দিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন। তিনি ঠিক্ আগেকার মত পবিত্র আছেন কিনা, আমাদের সবাইকে ঠিক্ আগের মত ভালোবাসেন কিনা, এটা পরীক্ষা হওয়া দরকার।"

লক্ষ্মীন্দরের কথা শুনে চাঁদ বিরক্ত হয়ে বল্লেন, "বাছা, তোমার বুদ্ধি-শুদ্ধি একেবারে লোপ পেয়েছে। যিনি দেবপুরে গিয়ে মরা-স্বামী বাঁচিয়ে আনতে পারেন, তাঁকে কি আবার পরীক্ষা করতে হবে? কোনো মানুষ

কি আবার এই অসম্ভব-কাজ করতে পারে নাকি? তুমি পাগলের মত কথা বলছ। আমার বউমার মত মেয়ে ত্রিভুবনে নেই।"

লক্ষ্মীন্দর বল্লেন, "তা হলেও একবার পরীক্ষা দরকার। পরীক্ষা না করে' ঘরের বৌকে এইভাবে সমাজে স্থান দেওয়া যায় না। এতে লোকেই বা বলবে কি?"

লক্ষ্মীন্দরের কথা শুনে বেহুলা হাসিমুখে বল্লেন, "বাস্তবিকই আমার পরীক্ষা হওয়া উচিত। আপনারা যে কোনো ভাবে আমার পরীক্ষা করুন, আমি সব সময়েই রাজি আছি।"

তখন আরম্ভ হোলো ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর সব পরীক্ষা। কখনো তাকে হাত-পা বেঁধে সমুদ্রের জলে ফেলে দেওয়া হোলো, বিষাক্ত সাপে ভর্তি পাত্রের মধ্যে তাঁকে হাত দিতে হোলো, লোহা আগুনে গরম করে' তাঁর হাতে দেওয়া হোলো, বিষপূর্ণ পাত্র তাঁকে পান করতে দেওয়া হোলো, আর সর্বশেষে জ্বলন্ত-আগুনের কুণ্ডে তাঁকে ঝাঁপ দিতে হোলো।

কিন্তু এই সব পরীক্ষাতেই সতী বেহুলা উত্তীর্ণ হলেন। কোনো পরীক্ষাতেই তাঁর বিন্দুমাত্র ক্ষতি হোলো না।

এই দৃশ্য দেখে সবাই ধন্য ধন্য করতে লাগল, আর সকলের সামনে প্রমাণ হয়ে গেল বেহুলা ঠিক্ আগের মতই আছেন, একটুও বদলাননি।

বিয়ের পরই লক্ষ্মীন্দরের মৃত্যু হয়েছিল, কাজেই বাসি-বিয়ের আর সময় বা সুযোগ হয়নি। এইবার বাসি-বিয়ের আয়োজন আরম্ভ হোলো।

লক্ষ্মীন্দরের বাসি-বিয়ে হবে। আবার রাজ্যে ধুমধাম 'পড়ে' গেল, আনন্দ উৎসবে সবাই মেতে উঠল।

রাজা মুক্তেশ্বর তাঁর সাত-ছেলেকে নিয়ে চম্পক-নগরে এলেন। চাঁদের

যত জ্ঞাতি-বন্ধু আত্মীয়স্বজন ছিলেন, সবাই দলে-দলে এসে হাজির হলেন নিমন্ত্রণ পেয়ে।

শুভদিনে শুভক্ষণে লক্ষ্মীন্দরের বাসি-বিয়ে হয়ে গেল। চাঁদের আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধব সবাই পরম পরিতোষের সঙ্গে ভোজন করলেন। এমন খাওয়া অনেকদিন কেউ খাননি। যে দেশের যে জিনিস প্রসিদ্ধ,—চাঁদ তাই জোগাড় করে' এনেছেন। খরচের জন্যে কিছু ভাবেননি।

লুচি-মণ্ডা, দই-ক্ষীর, রাবড়ী—সবই সেরা সেরা জিনিস। যে যত পারো খাও। সে দেশের ভোজনবিলাসীরা এই সব খাবার খেয়ে দু' হাত তুলে চাঁদকে আশীর্বাদ করতে লাগল। তারপর চাঁদ-সওদাগর সকলকে কাপড় আর অলঙ্কার দান করলেন। সবাই সন্তুষ্ট হয়ে শতমুখে চাঁদের প্রশংসা করতে লাগল।

চাঁদ-সওদাগরের আরো ছয়-পুত্রবধূ এতদিন বিধবার বেশে ছিলেন,—তাঁদের সঙ্গেও চাঁদের ছয়-পুত্রের আবার মিলন করিয়ে দেওয়া হোলো। বধূরা বিধবার বেশ ছেড়ে মাথায় সিঁদুর ধারণ করলেন, নানা অলঙ্কারে সাজলেন।

চাঁদ-সওদাগরের আদেশে রোজ রোজ ঘরে ঘরে মনসাদেবীর পূজো হতে লাগল। তাঁর সম্পত্তি ক্রমেই বেড়ে চল্ল। পদ্মাবতীর বরে তাঁর সমস্ত দুঃখ ঘুচে গেল।

———
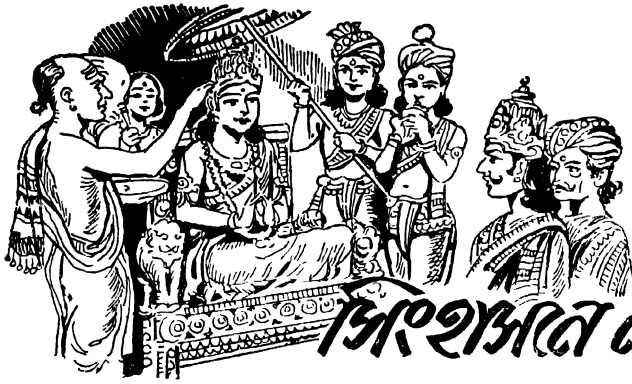
চাঁদ-সওদাগর ক্রমে বুড়ো হয়ে উঠছেন, আর রাজকার্য চালাতে পারেন না, তাই তাঁর ইচ্ছা লক্ষ্মীন্দরকে সিংহাসনে বসিয়ে তিনি বাকী জীবনটা মনসা-দেবীর পূজো করে কাটিয়ে দেন।

এ বিষয়ে সকলের পরামর্শ নেওয়া হোলো। চাঁদের গুরুদেব শ্রীধর পণ্ডিত, বৃদ্ধ-খুড়া যশোধর প্রভৃতি সকলেই সম্মতি দান করলেন। রাজ্যের যত ব্রাহ্মণ আর ভাটের দল একসঙ্গে হয়ে পঞ্জিকা দেখে শুভলগ্ন স্থির করলেন। তারপর সেই শুভদিনে মহাধুমধামের সঙ্গে লক্ষ্মীন্দরকে সবাই সিংহাসনে বসাল।

লক্ষ্মীন্দর রাজ্যের সকলেরই অতি প্রিয়। তিনি সিংহাসনে বসাতে সকলেই যে আনন্দে মেতে উঠল, সে কথা আর না বল্লেও চলে। ঘরে ঘরে চল্ল আনন্দ-উৎসব, রাজ্য জুড়ে চল্ল আমোদ-প্রমোদ।

চাঁদ-সওদাগর অবসর গ্রহণ করলেন, লক্ষ্মীন্দর হলেন চম্পক নগরের রাজা।

নতুন রাজাকে পেয়ে রাজ্যের সবাই খুব খুসি। লক্ষ্মীন্দরও নিজে পুত্র-স্নেহে প্রজাদের পালন করতে লাগলেন।

লক্ষ্মীন্দর ছিলেন অত্যন্ত ধার্মিক আর ন্যায়পরায়ণ, কাজেই তাঁর সুশাসনে শীগ্‌গিরই রাজ্যের যথেষ্ট উন্নতি হোলো। প্রজাদের সমস্ত দুঃখ দূরে গেল, ঘরে ঘরে শান্তি বিরাজ করতে লাগল।

চাঁদ-সওদাগর আর সনুকার মনে আনন্দ আর ধরে না। পুত্রের সুখ্যাতির কথা তাঁদের কানে আসতে লাগল অবিশ্রান্তভাবে। তাঁরা পরম শান্তিতে সর্বদা মা-মনসার চরণ ধ্যান করে' সময় কাটাতে লাগলেন।

পদ্মার মহিমার কথা পৃথিবীর চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল।

পদ্মা এতে এত সন্তুষ্ট হলেন যে তা আর বলবার নয়। তিনি তাঁর সহচরী নেতাকে নিয়ে স্বর্গ থেকে প্রায় মর্তে নেমে আসেন, আর আড়াল থেকে নিজের পূজো দেখে নয়ন সার্থক করেন।

পদ্মার নাগ-সৈন্যেরাও তাঁর আদেশে চম্পক-নগর পাহারা দেয়। তাদের উপদেশ দেওয়া আছে, যদি কোনো বিদেশী শত্রু লক্ষ্মীন্দরের রাজ্য আক্রমণ করতে আসে তবে তারা যেন প্রাণপণে তাদের বাধা দেয়।

এইভাবে পদ্মাদেবীর কৃপায় লক্ষ্মীন্দর নির্ভয়ে আর নিরাপদে রাজ্য পরিচালনা করতে লাগলেন।

———

বেহুলা লক্ষ্মীন্দরের বিদায় গ্রহণ

আমরা লক্ষ্মীন্দর আর বেহুলার পূর্বজন্মকথা জানি। তাঁরা পূর্বজন্মে ছিলেন অনিরুদ্ধ আর ঊষা। ইন্দ্রের অভিশাপে তাঁরা পৃথিবীতে এসে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সে কথা আমরা আগেই জেনেছি। ষোলো বছর পৃথিবীতে তারপর আবার তাঁদের ইন্দ্রপুরে ফিরবার কথা।

দেখতে দেখতে ষোলো বছর কেটে গেল।

ইন্দ্রদেব এতদিন ঊষা-অনিরুদ্ধের কথা ভুলেই ছিলেন, হঠাৎ একদিন তাঁর মনে অতীতের স্মৃতি জেগে উঠল।

ইন্দ্রের সারথি ছিলেন মাতলি। তিনি তাঁকে ডেকে বল্লেন, এক্ষুণি তুমি রথ নিয়ে চম্পক-নগরে যাও। সেখানে ঊষা আর অনিরুদ্ধ আছে বেহুলা আর লক্ষ্মীন্দরের রূপে। তুমি শীগ্‌গির তাদের আমার কাছে নিয়ে এসো।”

ইন্দ্রের আজ্ঞা পেয়ে মাতলি অমনি রথ সাজিয়ে চম্পক-নগরে বেহুলা আর লক্ষ্মীন্দরের কাছে এসে উপস্থিত হলেন।

লক্ষ্মীন্দর-বেহুলাও তাঁদের পূর্বজন্মের কথা ভুলে গেছিলেন, এইবার ইন্দ্রের সারথি মাতলিকে দেখে তাঁদের সব কথা মনে পড়ল। তাঁদের যে

এইবার আবার দেবপুরে ফিরতে হবে এ কথাও তাঁরা বুঝতে পারলেন।

তখন বেহুলা আর লক্ষ্মীন্দর মনসাদেবীকে স্মরণ করলেন। স্মরণমাত্রই তিনি তাঁদের কাছে উপস্থিত হলেন।

লক্ষ্মীন্দর বল্লেন, "মা-মনসা, তোমার চরণ ছাড়া আমাদের আর অন্য গতি নেই। চাঁদ-সওদাগরের সঙ্গে তোমার বিবাদ ঘুচে গেছে, আমাদের পৃথিবীর কর্তব্যও শেষ হয়ে গেছে, এবার আমরা স্বর্গে যেতে চাই।"

লক্ষ্মীন্দরের কথা শুনে পদ্মাবতী খুব খুসি হলেন, আর বল্লেন, "মাতলি তোমাদের নিতে এসেছে, তার সঙ্গে তোমরা ইন্দ্রপুরীতে চলে' যাও।" এই অনুমতি দিয়ে হংসরথে চড়ে' মনসাদেবী অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

বহুদিন পর লক্ষ্মীন্দরের সঙ্গে দেব-সারথি মাতলির দেখা। সমস্ত রাত তাঁরা নানারকম গল্প করে' কাটালেন।

তারপর খুব প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করে বেহুলা আর লক্ষ্মীন্দর স্নান সেরে ভক্তিভরে মনসার পূজা করলেন, তারপর চল্লেন পিতামাতার কাছে বিদায়গ্রহণ করতে।

চাঁদ-সওদাগর বা সনুকা দেবী লক্ষ্মীন্দর বেহুলার পূর্বজন্মের বিষয় কিছুই জানতেন না। তাঁরা যখন জানলেন যে তাঁদের পুত্র আর পুত্রবধূ স্বর্গে যাবেন, তখন তাঁরা একেবারে আশ্চর্য হয়ে গেলেন। সনুকা দেবী অবাক্ হয়ে প্রশ্ন করলেন, "সে কি কথা, তোমরা মানুষ হয়ে স্বর্গে যাবে কি করে'?"

তখন লক্ষ্মীন্দর আর বেহুলা তাঁদের পূর্বজন্মের কথা ভেঙে বল্লেন। তাঁরা পূর্বজন্মে স্বর্গের-বিদ্যাধর আর বিদ্যাধরী ছিলেন, ইন্দ্র তাঁদের বিনা দোষে শাপ দিয়েছিলেন ইত্যাদি সমস্ত কথাই খুলে বল্লেন।

● বেহুলা-লক্ষ্মীন্দরের বিদায় গ্রহণ ●

তাঁদের মুখ থেকে সমস্ত কথা শুনে যখন সুনুকা বুঝতে পারলেন যে এবার লক্ষ্মীন্দর আর বেহুলা তাঁদের কাছ থেকে চিরবিদায় নিয়ে যাবেন, তখন তিনি মাটিতে আছড়ে পড়ে' চিৎকার করে' কাঁদতে আরম্ভ করলেন। চাঁদসওদাগরেরও চোখের জলে বুক ভেসে যেতে লাগল।

লক্ষ্মীন্দরের অন্য ছয় ভাই, তাঁরাও খবর পেয়ে ছুটে এলেন, তাঁদের বধূরাও এলেন, লক্ষ্মীন্দর আর বেহুলা তাঁদের ছেড়ে চিরদিনের মত বিদায় নেবেন শুনে সবাই মিলে সে কী কান্না! লক্ষ্মীন্দর আর বেহুলাকে ছেড়ে দিতে তাঁদের যেন বুক ফেটে যাচ্ছিল।

লক্ষ্মীন্দর আর বেহুলা সবাইকে সান্ত্বনা দিয়ে শান্ত করলেন, তারপর সকলের কাছে বিদায় নিয়ে তাঁরা মাতলির রথে চড়ে' উজানী-নগরে উপস্থিত হলেন।

চাঁদের হারিয়ে চম্পক-নগরের ঘরে ঘরে যেন শোকের ঝড় বইতে লাগল।

প্রজারা সব বলতে লাগল—"লক্ষ্মীন্দরের মত এমন রাজা আমরা পাব কোথায়? আমাদের নতুন রাজা চলে' গেলেন, আর আমাদের বুঝি কপাল পুড়লো।"

সকলের নাক দিয়েই যেন বড় বড় দুঃখের নিঃশ্বাস পড়তে লাগল।

বিয়ের পর বেহুলা আর বাপের-বাড়ী উজানী-নগরে আসেননি। লক্ষীন্দরের সঙ্গে তাঁকে দেখে দেশের লোকেরা কেউ আর তাঁকে চিনতে পারল না।

চাঁদের দুজনের অপূর্ব রূপের ছটায় সকলে মুগ্ধ হয়ে গেল। মানুষ যে এত সুন্দর হতে পারে, তা তাদের ধারণা হোলো না।

কেউ বল্লে, "এঁরা হচ্ছেন স্বর্গের বিদ্যাধর-বিদ্যাধরী, মানুষের রূপ ধরে' এসেছেন।

কেউ বল্লে, "তা নয়, স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র এসেছেন শচীদেবীকে সঙ্গে নিয়ে।"

কারুর ধারণা হোলো এঁরা শিব আর পার্বতী। কেউ বল্লে, "স্বয়ং নারায়ণ এসেছেন লক্ষীদেবীকে সঙ্গে করে'।"

লক্ষীন্দর আর বেহুলাকে দেখে দেশের লোকেরা এইভাবে নানারকম আলোচনা করতে লাগল।

মনসাদেবীর মায়ায় বেহুলার বাবা-মাও মেয়ে-জামাইকে চিনতে পারলেন না।
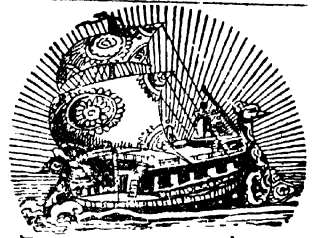
লক্ষ্মীন্দর-বেহুলাও তাঁদের কাছে নিজেদের নর্তক নর্তকী বলে' পরিচয় দিলেন, আসল পরিচয় গোপন রাখলেন।

রাজা মুক্তেশ্বরের সভায় নাচগানের ব্যবস্থা হোলো। এই অনিন্দ্যসুন্দর দুটি নর্তক-নর্তকীর নাচ দেখে আর গান শুনে রাজ্যের সবাই স্তম্ভিত হয়ে গেল। এমন নাচ কেউ কোন দিন দেখেনি, এমন গানও কেউ শোনেনি।

তারপর লক্ষ্মীন্দর আর বেহুলা রাজা মুক্তেশ্বর আর রাণী কমলাকে প্রণাম করে' সকলকে যথাযোগ্য সম্ভাষণ জানিয়ে বিদায় নিলেন।

যাবার সময় বেহুলা তাঁদের নিজেদের পরিচয় দিয়ে আর সমস্ত বৃত্তান্ত আগাগোড়া একটি চিঠিতে লিখে নিজেদের বিছানার উপর ফেলে দিয়ে গেলেন।

পরদিন একজন দাসী সেই চিঠিখানা বেহুলার মাকে দিতেই, তিনি চিঠি পড়ে' সমস্ত বুঝতে পারলেন।

এতক্ষণে তিনি বুঝলেন তাঁর মেয়ে-জামাই এইভাবে তাঁদের ফাঁকি দিয়ে চলে' গেছে। নিদারুণ শোকে তিনি যেন ভেঙে পড়লেন। বেহুলার জন্যে চিৎকার করে কাঁদতে আরম্ভ করলেন।

ক্রমে রাজা মুক্তেশ্বরের কানে এ খবর গেল। তিনি মেয়ে আর জামাইয়ের শোকে 'হায় হায়' করতে লাগলেন। ক্রমে এই খবর চারিধারে ছড়িয়ে পড়ল। সকলের মনে নেমে এলো শোকের গভীর ছায়া।

* * *

যথাসময়ে ঊষা আর অনিরুদ্ধ ইন্দ্রপুরীতে ফিরে এলেন।

স্বয়ং পদ্মাবতী এসে ইন্দ্রকে বল্লেন, "হে' দেবরাজ, তোমার ঊষা আর অনিরুদ্ধকে আবার তোমায় ফিরিয়ে দিলাম। চাঁদ-সওদাগরের সঙ্গে আমার

বিবাদ ঘুচে গেছে, পৃথিবীর সর্বত্র আমার পূজো প্রচারিত হয়েছে।” এই বলে’ মনসাদেবী প্রসন্নমনে প্রস্থান করলেন।

উষা আর অনিরুদ্ধ ইন্দ্রদেবকে প্রণাম করলেন, তিনিও তাঁদের আশীর্বাদ করলেন। উষা আর অনিরুদ্ধকে আবার স্বর্গে ফিরে আসতে দেখে দেবলোকের অধিবাসীরা আনন্দে অধীর হয়ে উঠলেন।

সারা স্বর্গধামে মহাধুমধামে উৎসব আরম্ভ হোলো। সমস্ত দেব-দেবীরা এসে তাঁদের প্রাণভরে আশীর্বাদ করতে লাগলেন।

ষোলো বছর পরে আবার উষা-অনিরুদ্ধ স্বর্গে ফিরে এসেছেন। ইন্দ্রদেব তাঁর সারথি মাতলিকে বল্লেন, “সবাইকে খবর দাও, আজ আবার বহুদিন পরে আমার সভায় নাচ-গানের আসর বসবে। উষা আর অনিরুদ্ধ গান গাইবেন আর নৃত্য করবেন।”

এই খবর পেয়ে স্বর্গের দেবতারা দলে দলে এসে সেই নাচের আসরে যোগ দিলেন। কারুর আর আসতে বাকী রইল না।

সেদিন সেই দেবতাদের আসরে উষা আর অনিরুদ্ধ এমন নাচ-গান করলেন —তেমনটি আর কেউ কোনো দিন দেখেননি বা শোনেননি।

স্বর্গরাজ্যে ‘ধন্য ধন্য’ পড়ে’ গেল।

—সমাপ্ত—